উপন্যাস

এবার আমার মাথায় টোপর

নীললোহিত
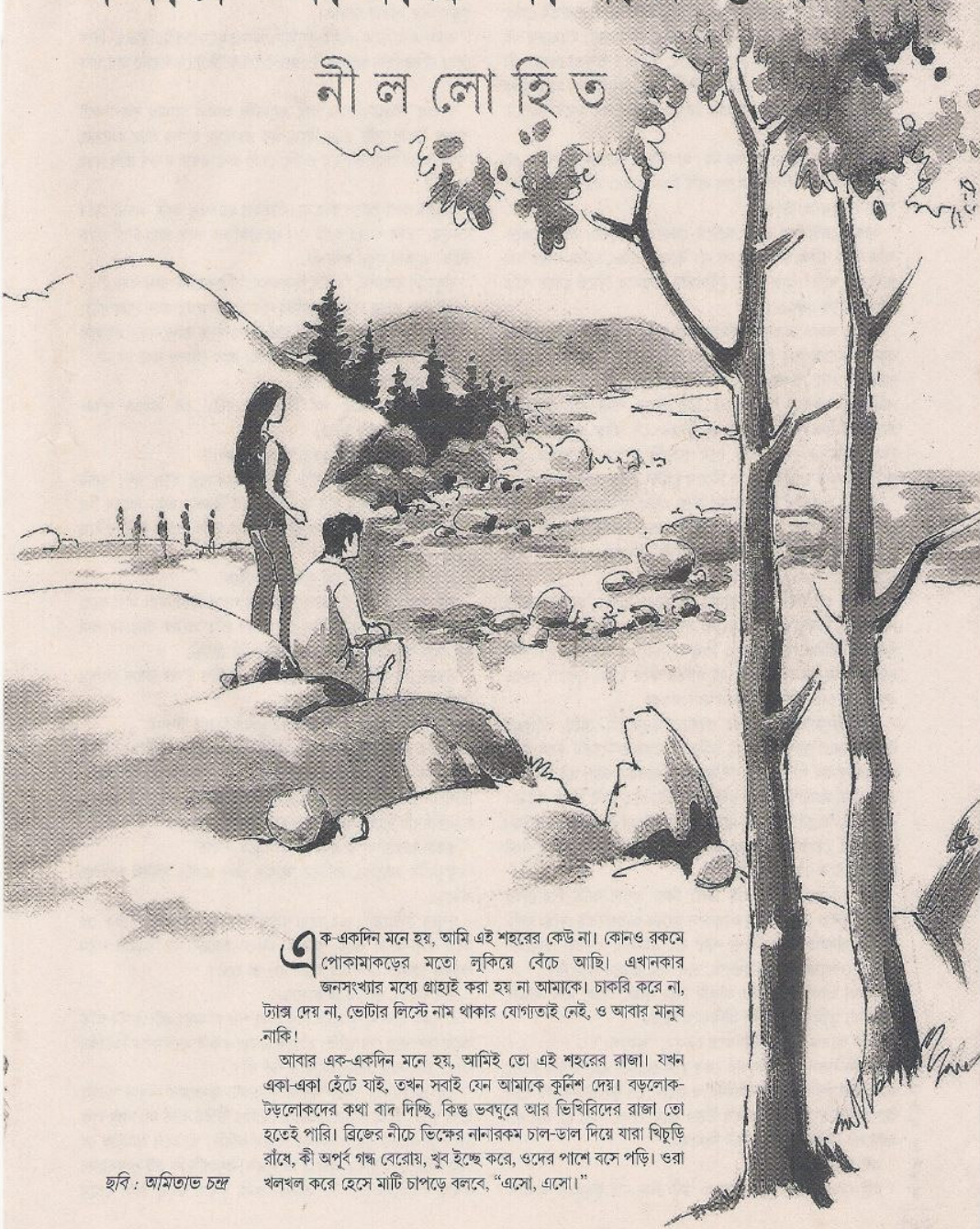
এক-একদিন মনে হয়, আমি এই শহরের কেউ না। কোনও রকমে পোকামাকড়ের মতো লুকিয়ে বেঁচে আছি। এখানকার জনসংখ্যার মধ্যে গ্রাহ্যই করা হয় না আমাকে। চাকরি করে না, ট্যাক্স দেয় না, ভোটার লিস্টে নাম থাকার যোগ্যতাই নেই, ও আবার মানুষ নাকি!

আবার এক-একদিন মনে হয়, আমিই তো এই শহরের রাজা। যখন একা-একা হেঁটে যাই, তখন সবাই যেন আমাকে কুর্নিশ দেয়। বড়লোক-টড়লোকদের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু ভবঘুরে আর ভিখিরিদের রাজা তো হতেই পারি। ব্রিজের নীচে ভিক্ষের নানারকম চাল-ডাল দিয়ে যারা খিচুড়ি রাঁধে, কী অপূর্ব গন্ধ বেরোয়, খুব ইচ্ছে করে, ওদের পাশে বসে পড়ি। ওরা খলখল করে হেসে মাটি চাপড়ে বলবে, "এসো, এসো।"

ছবি : অমিতাভ চন্দ্র

গরমকালের মধ্যরাতেও যারা ফুটপাথে সারি বেঁধে শুয়ে থাকে, বড় সাধ হয়, ওদের পাশে ঝুপ করে শুয়ে পড়ি। সারাক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে থাকলে আকাশ দেখা যায়। কলকাতা শহরের এত সব বাড়িতে যারা নিজের-নিজের বাড়ির বারান্দায় ঘুমোয়, তারা কি অনেকখানি চওড়া আকাশ দ্যাখে কখনও?

মায়ের জন্যই আমি এই সাধটা মেটাতে পারি না। যত রাতই হোক, আমি জানি, মা আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন বারান্দায়। মায়েদের এই এক দোষ। এত বড় হয়ে গিয়েছি আমি, তবু এত অপত্য স্নেহের কী আছে! কত লোক আছে, তারা নাইট ডিউটি দেয়। তাদের মায়েরা কি সারারাত জেগে থাকে? আমার চাকরি নেই বলেই মাকে জাগতে হবে?

এ সব যুক্তি-তর্কের ব্যাপার নয়। মা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়, এই দৃশ্যটা চোখে ভাসলেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। যত রাতই হোক। বন্ধুরা ঠাট্টা করে, তবু।

আজ সন্ধেটা বেশ ভাল কেটেছে, মেজাজ ফুরফুরে। তাই নিজেকে আজ আর পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে না। ইচ্ছে করলে বেসুরো গলায় গান গাইতেও পারি। আজ আমি দুনিয়াদার, কল্পনার দৌড়ে যেতে পারি যেখানে ইচ্ছে সেখানে।

এইটুকু অন্তত বোধবুদ্ধি আমার আছে, বুঝতে পারি, ইদানীং আমার বন্ধুরা আমাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না, বরং আমাকে টুকটাক অপমান করতেই তারা তৎপর। কয়েকজন একসঙ্গে মিলিত হলে খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারে আমি আর চাঁদা দিতে পারি না। রোজগার একেবারে নিল! এত প্রাণের বন্ধু প্রিতম, সে পর্যন্ত একদিন বলল, "আর কতদিন পরস্মৈপদী হয়ে চালাবি বাবা! অনেকদিন তো আমাদের ঘাড় ভাঙলি, এবার নিজের ঘাড়টা একটু সোজা কর!"

বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে, আড্ডা দিয়ে, আমি যে তাদেরই ধন্য করছি, তা আর অনেকেই মানতে চাইছে না। প্রায় সকলে বিয়ে-থা করে সংসারি হয়ে যাচ্ছে। সংসারি হয়ে গেলেই টাকাপয়সার হিসেব বুঝতে হবে? ছিঃ!

আমার সৌভাগ্য এই, আমার সাতখানা মাসি। আমার মায়ের পিসতুতো, মাসতুতো মিলিয়ে। এই সব মাসিদের বাড়িতে গেলে আমি খানিকটা খাতির পাই এখনও। কিন্তু মনে-মনে একটা হিসেব রাখতে হয়। খুব ঘন-ঘন হানা দিলে এই খাতির ক্ষয়ে যাবে। সুতরাং, অন্তত এক-একজনের বাড়িতে দু'-তিন মাস অন্তর।

আজ ঝুনুমাসির বাড়িতে। সেখানে ঝুনুমাসির মেয়ে পাপিয়ার জন্মদিন আর পাপিয়ার ছোট বোন রুবেলের লোরেটো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া, এই দুই উপলক্ষে খাওয়াদাওয়া। এই সব দিনে একটু চেনা-জানা আত্মীয়ের রবাহূত উপস্থিতিতে কেউ বিরক্ত হয় না। বরং বলে, "আরে নিলু, তুই এসেছিস, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! আয়, আয়, তোর মা বললেন, আসতে পারবেন না। আর নিলুটা কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই..."

খাওয়াদাওয়া বেশ ভালই ছিল। কিন্তু একটা অতি বিরক্তিকর ব্যাপার, কুইজ় সেশন। এটা আজকাল অনেক জায়গাতেই দেখি। আমি কোনও ধাঁধারই উত্তর দিতে পারি না। এমনকী, একজন একালের বাঙালি লেখকের কী-কী ছদ্মনাম, তাও আমার মনে পড়ে না।

রুবেল আমার হাঁটু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই, নিলু আঙ্কল, বলো না। তুমি তো বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়েছ!"

আমি কয়েক মিনিট চিন্তা করে বললুম, "বনফুল।"

রুবেল বলল, "সে আবার কে? (যে-লোকটি এই ধাঁধার আসর পরিচালনা করছিল, তার নাম নিল ও ব্রায়েন, সে খুব ভাল বাংলা জানা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সে আমার উত্তর শুনে বলল, "হল না, হল না। একালের লেখক, এখনও যিনি লিখছেন..."

এই তো অবস্থা!

যাই হোক, আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি ছিল না। ঝুনুমাসি আমাকে বেশ পছন্দ করেন। আমি কোনও চাকরিবাকরি করি না জেনে ঝুনুমাসি একবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে ওঁর পোষা কুকুর ও বেড়াল দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিতে। [illegible] কাজ নিতে আমি রাজি হইনি, কারণ, কুকুর আমি সহ্য করলেও করতে পারি, কিন্তু বেড়াল আমার একেবারেই অপছন্দ। ঝুনুমাসির তিনটে কুকুর আর সাতটা বেড়াল।

আমি এ বাড়িতে এলেই ঝুনুমাসি আমাকে ফেরার ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দেন। যদিও তিনি জানেন, ট্যাক্সির বদলে আমি ট্রামে-বাসেই যাতায়াত করি।

আজও খাওয়াদাওয়ার পর ঝুনুমাসি আমার জামার বুকপকেটে পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে, এক রহস্যময় হাসির সঙ্গে বললেন, "নিলু, আজ বাড়িতে গিয়ে শুনবি, তোর জন্য একটা দারুণ ভাল খবর আছে!"

এরকম কথা শুনলে কার না কৌতূহল হয়! তবু আমি কায়দা মেরে বললুম, "ভাল খবর? আমি তো প্রত্যেকদিনই ভাল খবর নিয়ে বেঁচে আছি! এ আর নতুন কথা কী!

ঝুনুমাসি বললেন, "এইটা অন্যরকম, সত্যিকারের ভাল খবর।"

এই কথা বলার সময় ঝুনুমাসির শরীরের উপরের অংশ দুলে ওঠে। মাসিদের এই ধরনের শরীর দোলানির দিকে ভাগনেদের সরাসরি তাকাতে নেই বলে আমি দৃষ্টি নিচু করি। আর কোনও কথা হয় না।

এখন রাত সাড়ে এগারোটা।

ট্রাম থেকে নামার পর টিপটিপে বৃষ্টি। এই সময়ও দু'জন রিকশাওয়ালা জেগে আছে।

একজন এগিয়ে এসে বলল, "দাদা, ওঠেন।"

এখান থেকে আমার বাড়ি মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ। আমি কোনওদিনই রিকশায় যাই না। কিন্তু এই রিকশাওয়ালা সাহেব সিং আমাকে চেনে। আমার দাদা-বউদি কিংবা মাকে প্রায়ই বাড়ি পৌঁছে দেয়।

আজ বৃষ্টি পড়ছে বলেই বুঝি ও ভেবেছে...

বৃষ্টি পড়লেই রিকশাওয়ালাদের বেশি পয়সা দিতে হয়। মাপ করো ভাই। কুড়ি টাকার কম দিলে তোমাদের প্রতি অনেক অবিচার করা হয়, আর কুড়ি টাকা বাঁচাতে পারলে আমি ট্রেনে...

সাহেব সিং দু'বার আমাকে ডেকেছে, আমিও দু'বার তাকে সেলাম জানিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

বৃষ্টি এত মিহি, যেন একটা চাদর দুলছে মাথার উপর।

আমার এক কাকা বলতেন, লন্ডনে নাকি প্রায়ই বৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের যে এত রকম বৃষ্টি, ইলশেগুড়ি, ঝিরিঝিরি, রিমিঝিমি, টিপিটিপি, আরও কত নাম আছে কি সেখানকার বৃষ্টির, কে জানে! লন্ডনের বৃষ্টি নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কী দরকার!

একটা রাস্তার বাঁকে এসে আমি থমকে দাঁড়াই।

ঝুনুমাসি বললেন, বাড়িতে আমার জন্য একটা সুখবর অপেক্ষা করছে।

দুপুরে বেরিয়েছি, এর মধ্যে আর কী সুখবর আসতে পারে? এর মধ্যে দাদা-বউদি শুয়ে পড়েছে, জেগে আছেন মা। আমার নামে কখনও কোনও টেলিগ্রাম আসে না। তা হলে?

ডান হাতের তালুটা চুলকোচ্ছে।

এ রকম হলে নাকি হঠাৎ কিছু টাকা পাওয়া যায়! এটা একটা অতি বাজে কুসংস্কার তো বটেই। হাতের চামড়া এমনই মাঝেমাঝে কিরকির করে। তার সঙ্গে টাকাপয়সার সম্পর্ক কী?

তবু ছেলেবেলা থেকে শোনা দু'-একটা কুসংস্কার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। আমি কখনও কোনও লটারির টিকিট কাটি না। লক্ষ-লক্ষ টাকা পুরস্কারের ধাপ্পাও কখনও বিশ্বাস করিনি। তা হলে আমাকে কে টাকা পাঠাবে? কোনও অজ্ঞাত মহানুভব! ঝুনুমাসি কি এই সুসংবাদের কথাই বলছিলেন? ধ্যাত! জীবনে আমি দু'বার উড়ুক্কু টাকা পেয়ে

গিয়েছি অকস্মাৎ। তখন হাতের তালু চুলকেছিল কিনা মনে নেই।

আমার চোখের দৃষ্টি সব বন্ধুবান্ধবের চেয়ে ভাল। বহুদূর থেকে বাসের নম্বর পড়তে পারি। [illegible] বন্ধুরা ইয়ার্কি করে বলে, "নিলু, দ্যাখ তো শিয়ালদার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে!"

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দেখেছিলুম, বেশ কয়েকজন সহপাঠিনীর চোখে চশমা। আর যেসব ছেলেরা চশমা পরে, তাদের সঙ্গেই ওই সব মেয়েদের বেশি ভাব হয়। আমার ধারণা হল, চশমা পরলে মুখখানা বেশ ইন্টেলেকচুয়াল-ইন্টেলেকচুয়াল দেখায়।

একটা চশমার দোকানে চশমা নিতে গিয়েছি, দোকানদার বললেন, "প্রেসক্রিপশন কোথায়?"

আমি অবাক। নিজের পয়সা দিয়ে চশমা কিনব, তার আবার প্রেসক্রিপশন লাগবে কেন? জামাকাপড় কিনতে প্রেসক্রিপশন লাগে? জুতো কিনতে? ঘড়ি কিনতে? দোকানে কতরকম চশমা সাজিয়ে রাখে, তার থেকে যে-কোনও একটা কিনতে পারি না?

দোকানদার বলল, "তোমাকে ভাই চশমা দিতে পারি। তাতে কাচ-টাচ মানে লেন্স থাকবে না। শুধু ফ্রেম! চমৎকার দেখাবে। সিনেমার নায়করা এই চশমা পরে। একটা চশমার ফ্রেম সে আমাকে পরিয়েও দিল ফস করে। আয়না দিয়ে তাকিয়ে দেখি। কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে! ঠিক যেন প্যাঁচার চোখ!

শুভময়ের দাদা চোখের ডাক্তার। হাজরার মোড়ে চেম্বার। শুভময়ের সঙ্গে কয়েকবার গিয়েছি সেখানে। চোখের ডাক্তারদের বেশ মজা। রোগীকে টুলে বসিয়ে উলটো দিকের একটা দেওয়ালে তাকাতে বলেন, সেখানে একটা বোর্ড ঝোলে, তাতে উলটোপালটা অ্যালফাবেট লেখা থাকে। কে, তারপর বি, তারপর ও, তারপর এন, তারপর এক্স। প্রথম লাইনটায় বড়-বড় অক্ষর, পরেরটায় ছোট, তার পরেরটায় একটু ছোট, তারপর আর-একটু ছোট। রোগীরা কেউ ভুলভাল পড়লেই বোঝা যায় চোখ খারাপ!

আমি তো ইচ্ছে করেই ভুলভাল বলতে পারি। কে দেখলে বলব কিউ, এম দেখলে বলব এ...

চেম্বার ফাঁকা, আমি গিয়ে বললাম, "বিকাশদা, দু'দিন ধরে চোখটা এমন কড়কড় করছে আর জল পড়ছে, একটু দেখে দাও না! মনে হয়, চশমা লাগবে!"

চোখের ডাক্তার হলেও বিকাশদা নিজে একটু ট্যারা। ত্যারচাভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "শুধু চোখ কড়কড় করে, না বুকও ধড়ফড় করে?"

আমি বললুম, "ঠিক তো, বুকও ধড়ফড় করছে কাল থেকে।"

বিকাশদা বললেন, "এই দু'দিন স্বপ্ন দেখেছিস?"

"না তো!"

"হুঁ!"

"খিদে বেড়ে গিয়েছে?"

"তা-ও বেড়েছে, সত্যি!"

"বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে, না সবসময় মনে হয়, কোথাও যাই কোথাও যাই?"

"আশ্চর্য, আপনি ঠিক ধরেছেন তো বিকাশদা!"

"হুঁ, কেস বেশ খারাপ! চশমা পরতে রাজি আছিস?"

"চশমা তো নিতেই হবে মনে হচ্ছে।"

বিকাশদা আমাকে একটা টুলে বসিয়ে বললেন "খুব বড় করে চোখ মেলে থাক।"

একটা সরু টর্চ জ্বেলে আমার চোখ দু'টো দেখলেন ভাল করে। দু'বার বললেন, "হুঁ, হুঁ!" তারপর চট করে কী যেন কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলেন আমার দু' চোখে। তাতে যে কী সাংঘাতিক জ্বালা করে উঠল, কী বলব! চোখের মধ্যে যেন আগুন লেগে গিয়েছে। আমি 'উঃ উঃ' করে চেঁচাতে-চেঁচাতে বললাম, "এটা কী দিলে বিকাশদা?"

বিকাশদা বললেন, "তুই চশমা পরতে চাস তো? তার ব্যবস্থা করছি।"

আমি প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম, "তাতে এত ব্যথা লাগে?"

বিকাশদা শান্তভাবে বললেন, "বাঃ, ব্যথা লাগবে না? তোর চোখে তো কিছুই হয়নি। তবু যাতে চশমা পরতে পারিস, তাই আগে চোখ দু'টো খারাপ করে দিচ্ছি।"

এবার আর প্রায় নয়, কেঁদেই ফেলতে হল। আমি যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছি জীবনের মতো। দু'টো চোখই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিকাশদার হাঁটু জড়িয়ে ফোঁপাতে লাগলুম।

বিকাশদা আমার চুলের মুঠি ধরে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "আবার চোখ খোল পুরোপুরি।"

বিকাশদা আবার চোখে কয়েক ফোঁটা কী যেন দিলেন! সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডা হয়ে গেল সব জ্বালা। পিপারমেন্ট লজেন্স খেলে যেমন হয়। বিকাশদা বললেন, "আর-একটা ওষুধ না দিলে চোখ ঠিক হবে না। চশমা পরার শখ হয়েছে! যেদিন সত্যি-সত্যি চোখ খারাপ হবে, সেদিন বুঝবি! অন্য ওষুধটা এখন তিনদিন রোজ দু'বেলা পাঁচ ফোঁটা করে দিবি। তার আগে প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কখনও সানগ্লাস পরবি না।"

"সানগ্লাস?"

"কোনও দরকার নেই, লোকে শখ করে ওইগুলো পরে আর চোখের ক্ষতিও করে। কখনও পরবি না বল?"

"না পরব না।"

"তবে যা! তোর চোখের যা ব্যবস্থা আমি করে দিলুম, অন্তত কুড়ি বছর কোনও চোখের ডাক্তারের কাছে তোকে যেতে হবে না।"

সত্যি কথা, তারপর থেকে আমি চোখে যেন আরও ভাল দেখছি। চশমাপরা মেয়েরা আমাকে পাত্তা দেয়নি বটে, তবে এই চোখের জন্য আমি অনেক উপকার পেয়েছি। দু'-দু'বার টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি রাস্তায়। একবার একটা দশ টাকার নোট। আর-একবার একটা রাবারব্যান্ড দিয়ে গোল করা বান্ডিল, দু'শো পঁয়তাল্লিশ টাকা। হয়তো তিন-চার বন্ধু একসঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি। শুধু আমারই এটা চোখে পড়ে।

আমার বউদি দিনের মধ্যে অন্তত তিনবার চাবি হারায়। কে খুঁজে দেয়? আমি ছাড়া আর কে? দুল পরতে গেলে কানের পিছনের দিকের একটা কবজা কুটুস করে খুলে পড়ে চলে যায় নিরুদ্দেশে। কল্পবিজ্ঞান সিনেমায় যেমন দেখা যায়, কারও-কারও চোখ দিয়ে আলোর জ্যোতি বেরিয়ে আসে, আমি বউদির আর্ত চিৎকার শুনে ঘরে এসে সেইরকম চোখে চতুর্দিকে তাকাই। সোনার টুকরোটার আর লুকিয়ে থাকার সাধ্য কী!

যতই হাতের তালু চুলকোক, আজ রাস্তায় কোনও ফালতু টাকাপয়সা পড়ে থাকতে দেখে গেল না।

মা ঠিকই দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। সদর দরজা খোলা। খুব-একটা রাত হয়নি। তবে একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। ঝুনুমাসির বাড়ি থেকেই ফোনে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে, আমি খেয়ে-টেয়ে আসছি। মা নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষায় রয়েছেন না খেয়ে। আমার খাবার রাখা আছে টেবিলে। তুলতে হবে। দাদা-বউদি সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে খেয়ে নেয় রোজ, যদি না দাদার কোনও বন্ধু-টন্ধু আসে।

উপরে উঠে আসতেই মা বললেন, "আবার আজ এত দেরি করলি?"

আমি বললুম, "এখনও বারোটা বাজেনি। তুমি বলেছিলে বারোটা হচ্ছে [illegible]।"

"কী করিস রাত পর্যন্ত? তোর বন্ধুরা সবাই এত দেরি করে ফেরে? এখন আবার বৃষ্টি হচ্ছে!"

"মা, এই বৃষ্টি এত মিষ্টি যে, ভিজিয়ে দেওয়ার বদলে যেন মনে হয়, আদর করছে। আজ বন্ধুদের সঙ্গেও এতক্ষণ ছিলুম না। তোমার এক বোনের বাড়িতে খুব খেয়ে এসেছি। কার বাড়িতে বলো তো?"

"ঝুনুর বাড়িতে?"

মায়ের যেন অলৌকিক শক্তি আছে। এক-একটা ব্যাপার একটুও চিন্তা না করে চোখের নিমেষে মিলিয়ে দেন। তারপরই মা আবার বললেন, "ও হোঃ! আজ তো পাপিয়ার জন্মদিন, কিছু উপহার-টুপহার নিয়ে গিয়েছিলি?"

নিতান্ত শান্ত, সুবোধ সংসারীর মতো আমি যাব মাসির বাড়িতে কোনও পুতুল কিংবা ফ্রক হাতে নিয়ে? উলটে আমিই যে পঞ্চাশটাকা রোজগার করে এনেছি, তা আর মাকে না বললেও চলে।

আর দু'-চারটে কথা বলেই মাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলাম খাবার ঘরে। কিন্তু সুসংবাদ কোথায়? আমি গন্ধ শুঁকতে থাকলুম। নাঃ, বাড়ি আজ অন্য দিনের মতোই। বড্ড চুপচাপ। এখন চলবে সাতঘণ্টার বিরতি। কাল সকালে কাজের মেয়ে এসে যখন দরজার বেল বাজাবে, তখন আবার জেগে উঠবে সবাই। বাথরুমে মুখহাত ধুতে গিয়ে মনে-মনে বললুম, "কোথায় বাবা সুসংবাদ, কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছ? দেখা দাও!"

নাকি এটা ঝুনুমাসির কোনও রসিকতা! এক-একজনের রসিকতার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। আমিই বা এত ব্যস্ত হচ্ছি কেন? বেশ তো আছি।

এই সময় বাথরুমে একটা মৃদু গন্ধ পেলুম। সাবান-টাবানের গন্ধ নয়, একটু অচেনা। সুসংবাদের গন্ধ কীরকম হয়? তা-ও তো জানি না।

॥ ২ ॥

সকালবেলায় চোখ মেলেই দেখি, আমার খাটের পাশে এক নারীমূর্তি দণ্ডায়মান। মনে হল, একেবারে অচেনা। ঘুম ভাঙার পর জগৎটাকেই তো কয়েক লহমার জন্য অচেনাই মনে হয়। অনেক সময় সংশয় হয়, এটা সকাল না বিকেল? আমি কোথায়? নিজের বাড়িতে না গিরিডির ডাকবাংলোয়? বাথরুমের দরজাটা কোনদিকে?

আমার পায়ের দিকের দেওয়ালে কোণার্ক মন্দিরের সুরসুন্দরী মূর্তির মতো একটা ছবি। অর্থাৎ, এটা আমারই চিরপরিচিত ঘর। আমার ঘরে এই সক্কালবেলা এক অচেনা নারী আসবে কী করে?

সুন্দরী যুবতী হলেও না হয় মনে করা যেতে পারত যে, আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ইনি মধ্যবয়সিনী, মাথার চুল কাঁচাপাকা। এক প্রৌঢ়া রমণীকে আমি খামোকা ভোরের স্বপ্নে ডেকে আনতে যাব কেন?

প্রতি সকালে চা তৈরির পর মা-ই এসে আমাকে ডেকে তোলেন। মায়ের হঠাৎ এমন বদল হল কী করে?

আসলে প্রথম চোখ মেলবার পরও আমার কাজ-বুদ্ধির ঘুম ভাঙতে খানিকটা দেরি লাগে। নইলে এর মধ্যেই আমার বোঝা উচিত ছিল, ইনি তো আমার আর-একখানা মাসি, ঘাটশিলার তৃপ্তিমাসি।

তিনি হাসিমুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

রাত্তিরে শোবার সময় আমি গেঞ্জি, পাজামা-টাজামা পরি না, খালি গায়ে শুধু একটা জাঙ্গিয়া পরা থাকে। তার উপর একটা পাতলা চাদর চাপা দিই।

মায়ের সামনে জাঙ্গিয়া পরে থাকতেও লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু মাসির সামনে কি এই বেশে দর্শন দেওয়া যায়?

চাদরটা দিয়ে গা ঢাকা রেখেই উঠে বসে বললুম, "ও মা, তৃপ্তিমাসি, তুমি কখন এলে?"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "কাল কতক্ষণ তোর জন্য জেগে বসে রইলাম। তুই কত রাতে ফিরলি!"

'কত রাতে' কথাটা আপেক্ষিক। গেরস্থ, ছিঁচকে চোর ও সন্ন্যাসীরা রাত্তিরটাকে নানারকমভাবে ভাগ করে নেয়। আজকাল কল সেন্টারের কর্মী ও বেকার যুবকরাও সেই দলে পড়ে।

আমি বললুম, "এই একটু রাত হয়ে গেল। তুমি কেমন আছ?" এবার খাট থেকে নেমে প্রণাম করা উচিত।

চাদরটাকে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে নিয়ে নেমে পড়লুম খাট থেকে। তৃপ্তিমাসি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বললেন, "ইস, কতদিন চুল কাটিস না রে? এই চুলের মধ্যে তো পাখিরা বাসা করতে পারে!"

আমি হেসে বললুম, "এখন কলকাতায় ছেলেদের বড় চুল রাখাই তো ফ্যাশন। আর মেয়েরা অনবরত চুল ছোট করে। তাতে অবশ্য ছেলেদের বেশ পয়সা বেঁচে যায়।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "তোকে আর পয়সা বাঁচাতে হবে না। দাঁড়া, আমি আজই ব্যবস্থা করছি। যা, মুখ-টুখ ধুয়ে আয়।"

সকালবেলা চায়ের টেবিলে সবাইকে একসঙ্গে বসতে হয়। দাদার সঙ্গে যা দেখা, তা এইটুকু সময়ের জন্যই। রাত্তিরে সাধারণত দাদা শুয়ে পড়ার পরই আমি ফিরি। তার জন্য আমাকে দোষ দেওয়া যায় না, আমি তো বাড়িতে থাকি সারা দুপুর! রোববার ছাড়া।

চায়ের টেবিলেই দাদার মেজাজ ভাল না থাকলে আমার উপর নানান উপদেশ ঝাড়ে। আবার এক-একদিন অবশ্য দাদা নানারকম গল্প করে, আমাকে জিজ্ঞেস করে, "আজকাল তোদের বয়সি ছেলেমেয়েদের কী সব জোক চলে! তার দু'-একটা বল তো আমাকে!"

আজ তৃপ্তিমাসি রয়েছে, আজ বকুনির দিন নয়।

বাথরুম থেকে পাজামা আর হাফহাতা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে দেখি, দাদা কী নিয়ে যেন বকাবকি করছে বউদিকে।

স্বামী-স্ত্রীর কলহের মধ্যে মাথা গলাতে নেই বলে মা আর তৃপ্তিমাসি দু'জনেই চুপ।

দাদা আমাকে বলল, "অ্যাই নিলু, দ্যাখ তো আমার আলমারির চাবিটা খুঁজে পাস কিনা। তোর বউদি কোথায় রেখেছে...কতবার বলেছি, তুমি তোমার আলমারি নিয়ে থাকো, আমার আলমারিতে হাত দিও না।"

বউদি বলল, "তুমি বুঝি নিজে কখনও চাবি হারাও না? সবসময় আমার উপর দোষ!"

আমি 'দেখছি' বলে চায়ে চুমুক দিতে গিয়েছি, দাদা আবার বললেন, "আগে চাবিটা দ্যাখ, পরে চা খাবি। আমাকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। অফিসের জরুরি কাগজপত্র..."

আমি প্রথমে ঢুকলাম দাদা-বউদির ঘরে।

এখনও বিছানা তোলা হয়নি। মশারিটা গোটানো। বালিশের পাশে বই। যদিও আর-একটা ছোট লাইব্রেরি ঘর আছে, তবু এ ঘরের খাটের নীচেও বই থাকে স্তূপ করা। দাদা পড়ুয়া মানুষ। অনেক বই কেনে, ইংরেজিই বেশি।

আমি একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সুর করে একটা মেয়েলি খেলার অনুকরণে বলতে লাগলুম, 'আয় তো রে আমার গোলাপ ফুল, আয় তো রে আমার চোখের বালি, আয় তো আমার দাদার আলমারির চাবি, একটু ঝুন-ঝুন শব্দ করে!'

এভাবে কিছু হয় না জানি। সায়েন্স ফিকশনের অন্য গ্রহের মানুষদের মতো আমার চোখ দিয়ে জ্যোতিও বেরোয় না। কিন্তু একটু বাদে চোখ বুজে কিছুক্ষণ থাকলে আকস্মিক ফল পাওয়া যায়।

চোখ বুজে আমি দেখতে পেলুম, চাবিটা দাদার আলমারির মধ্যেই, আর-একটা ছোট আলমারি, যাকে বলে লকার, সেখানে ঝুলছে।

এই রে সর্বনাশ! চাবিটা ভিতরে থেকে গিয়েছে, আর কোনওক্রমে

বন্ধ হয়ে গিয়েছে আলমারি [illegible] তা হলে তো আলমারির লক ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রস্তাবটা দেওয়াও বিপজ্জনক। যদি ভিতরে না থাকে? চোখ বুজে আমি যা দেখেছি তা যে ধ্রুব সত্য, তা কী করে বাজি রেখে বলি?

আলমারির হাতলটা ধরে একটু টানাটানি করতেই সেটা ঘটাং করে খুলে গেল!

চাবি পাওয়া যাবে না বলে দাদা-বউদি দু'জনেই আলমারিটা খোলাই রয়েছে কিনা, তা ভাল করে চেক করে দ্যাখেনি। সত্যিই ভিতরে রয়েছে চাবির গুচ্ছ, ঠিক ঝুলছে না, জামা-প্যান্টের উপর রাখা।

টেবিলে ফিরে এসে খুব অবহেলার সঙ্গে দাদার সামনে চাবির গোছাটা আস্তে ছুড়ে দিয়ে আমি আবার চুমুক দিলাম চায়ে।

দাদা তো বটেই, আর সবাই হতবাক!

দাদা জিজ্ঞেস করল, "এত সহজে তুই কী করে পেলি রে নিলু? আমি সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।"

আমি বললুম, "শার্লক হোম্‌স হলে বলত, এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন!"

দাদা বলল, "ও দু'টো কথা কখনও একসঙ্গে বলেননি শার্লক হোম্‌স। যাই হোক, কোথায় পেলি?"

আমি বললুম, "ট্রেড সিক্রেট, ট্রেড সিক্রেট!"

দাদা বলল, "যাই হোক, গুড জব। তুই আজ একটা ডাবল ডিমের ওমলেট খা।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "সত্যিই তো, নিলু আমাদের তাক লাগিয়ে দিল!"

বউদি আমার দিকে আধো-প্রেমের একটা দৃষ্টি দিয়ে বলল, "নিলুই তো সবসময় আমাদের হারানো জিনিস খুঁজে দেয়। দেখুন মাসিমা, বাড়িতে একজন বেকার দেওর থাকার কত সুবিধে। বাজার করা, ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়া, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, এসব অন্য লোককে দিয়ে করাতে হলে টাকা দিতে হত না? ওর দাদা তো কিছুই করে না!"

দাদা টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়েছে এর মধ্যে।

তৃপ্তিমাসি বললেন, "তা হলে তো নিলু এ বাড়ি থেকে চলে গেলে তোমাদের অনেক অসুবিধে হবে!"

বউদি একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "নিলু এ বাড়ি থেকে চলে যাবে? কোথায় যাবে? অবশ্য মাঝেমাঝে ও কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়, কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ায়, ওর নাকি একটা দিকশূন্যপুর আছে, সে ক'দিন আমরা চালিয়ে নিই। জানি তো ফিরে আসবেই।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "সে কথা বলছি না! নিলুর কি চিরটাকালই এইভাবে কাটবে নাকি? বাউণ্ডুলেপনা করে আর কতদিন কাটাবে? চাকরি-বাকরি তো করতেই হবে। তারপর বিয়ে-থা করবে।"

বউদি খিলখিল করে হেসে উঠল।

তৃপ্তিমাসি একটু ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, "হাসলে কেন?"

বউদি বলল, "নিলু বিয়ে করবে...এটা যেন ভাবতেই পারা যায় না!"

তৃপ্তিমাসি এবার ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, "কেন ভাবতে পারা যাবে না? নিলু কীসের অযোগ্য? একটা কিছু রোজগারের ব্যবস্থা হলেই... বয়সও কম হল না। এই নিলু, এখন কত বয়স রে তোর?"

আমার বদলে মা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "এই তো এই মাঘ মাসে সাতাশে পা দিল!"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "তবে? তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন ওর দাদা খোকনের বয়স কত? পঁচিশ! আমার ঠিক মনে আছে।"

বউদি বলল, "আমার বর তখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট!"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "সে যাই হোক গে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হলেও বুঝি, বিয়ে হবে না? আমার স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টও নয়, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তারও না। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই তো..."

তৃপ্তিমাসি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে নিলু, তুই বিয়ে করতে চাস না?"

আমি বললুম, "কেন চাইব না? অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা কবে পাব, তার জন্যই তো হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।"

তৃপ্তিমাসি হেসে বললেন, "পাবি, পাবি! সেজন্যই তো বলছিলাম, নিলু বিয়েটিয়ে করে সংসারী হলে নিশ্চয়ই অন্য জায়গায় গিয়ে থাকবে। এখনকার ছেলেরা তো বিয়ের পর মা-বাবা কিংবা দাদা-বউদির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে চায় না। তখন তোমাদের বেশ অসুবিধে হবে।"

বউদি বললেন, "হোক অসুবিধে। নিলু বিয়ে করলে আমি ওর নতুন বাড়ি সাজিয়ে দিয়ে আসব।"

তৃপ্তিমাসি মায়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা ইঙ্গিত করলেন।

বেশ ভারী চেহারা তৃপ্তিমাসির। ইদানীং যেন আরও কিছুটা চর্বি বৃদ্ধি হয়েছে। ফরসা রং, চামড়া যেন ফেটে পড়ছে, টুসটুস করছে মুখখানা।

বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "মাসি, আর-একটু চা খাবেন?"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "আমি রোজ সকালে তিন কাপ চা খাই। তোমার মনে নেই?"

বউদি চায়ের জল চাপাতে রান্নাঘরে যেতেই তৃপ্তিমাসি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নিলু তোর হাতে এখন তেমন কোনও কাজ নেই তো?"

আমি বললুম, "কাজ থাকবে না কেন? অনেক কাজ। ইরাকে যে আমেরিকানরা অত্যাচার চালাচ্ছে, সেটা তো আমাকেই থামাতে হবে। নর্থ বেঙ্গলে যে ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে, সেটা আবার মেরামত করার দায়িত্বও তো আমার। দেশে যে বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তা আবার বাড়াবার জন্যও..."

তৃপ্তিমাসি ধমক দিয়ে বললেন, "থাম তো। ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে! তোর যাই-ই কাজ থাক, তুই আজ ঘাটশিলা যাবি আমাদের সঙ্গে।

"আমাদের মানে?"

"দিদিকেও নিয়ে যাব। তোর মা কতদিন কোথাও যায়নি। তুই যে এত ঘুরে বেড়াস চতুর্দিকে, কখনও মাকে সঙ্গে নিয়ে যাস?"

"হ্যাঁ, যাই তো! মাকে যে একবার বেলুড় মঠ নিয়ে গেলাম!"

"সেটা কী বেড়ানো হল?"

মা বললেন, "বেলুড় মঠ গিয়েছিলাম, সেও তো বছর ছয়েক হয়ে গেল।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "ঘাটশিলায় এই সময়টা এত সুন্দর! শীত কমে এসেছে, তবু রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসতে বড় আরাম। কত ফুল ফোটে। টাকা দিচ্ছি, তুই তিনখানা ট্রেনের টিকিট কিনে নিয়ে আয়।"

আমি বললুম, "মাসি, তুমি তো মোটে কাল রাত্তিরে এলে, আজই চলে যেতে চাইছ কেন?"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "আমার যেদিন ইচ্ছে হবে, সেদিন আসব, যখন ইচ্ছে, চলে যাব। গিয়েছিলাম তো দিল্লি, ফেরার পথে কানপুরে তিনদিন, পরশু কলকাতায় ফিরে ঝুনুর বাড়িতে একদিন আর তোদের বাড়িতে এক রাত। এবার ফিরতে হবে না!"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি দিল্লি-কানপুর একলা-একলা গিয়েছিলে?"

“এখন [illegible] কেন, আমি একা যেতে পারি না?”

“তা তো পারই। তা হলে তুমিই তো মাকে ঘাটশিলায় নিয়ে যেতে পার। আমকে সঙ্গে যেতে হবে কেন?”

“যেতে হবে, সেটা আমার হুকুম। আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তা তো বলিনি! টিকিটের অফিস ক'টায় খোলে?”

মা-মাসির সঙ্গে যারা বেড়াতে যায়, তারা অতি শান্ত, বাধ্য, সুশীল বালক। আমার টাইপটাই যে অন্য। যত্রতত্র ভোজন আর হট্ট মন্দিরে শয়নই আমার পছন্দ।

তবে ঘাটশিলায় অনেকদিন যাইনি। একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসার আমন্ত্রণটাও লোভনীয়।

সন্ধেবেলা ট্রেনে চাপার সময় হঠাৎ মনে হল, ঝুনুমাসি যে সুখবরের কথা বলেছিলেন, এটাই কি তাই?

কিন্তু ঘাটশিলায় যাওয়াটা এমন কী সুখবর হতে পারে?

আরও একটা প্রশ্ন, আমাকে যে ঘাটশিলায় যেতেই হবে, তা কি ঝুনুমাসি জানতেন? দুই মাসির দেখা হয়েছিল ঠিকই।

অন্য বোনদের তুলনায়, আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব যেন কিছুটা কম। মা অপরের উপর তেমন জোর খাটাতে পারেন না। তৃপ্তিমাসি যেমন অবলীলাক্রমে আমাকে বললেন, “তোকে যেতে হবে, আমার হুকুম!” তখন আমি যদি মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু ভাবে বলতুম, “আমি এখন যেতে পারছি না মা। আমার একটা বিশেষ কাজ আছে,” মা নিশ্চিত তখন বলতেন, “থাক রে তৃপ্তি, নিলু যখন যেতে পারবে না বলছে, ওকে ছেড়ে দে।”

অবশ্য, আমি যাচ্ছি বলে মা যে খুশি হয়েছেন, তা ওঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মাঝেমাঝে মাকে খুশি করা ভালই তো। আবার কবে যে দুঃখ দিতে হবে, তার কি ঠিক আছে?

তৃপ্তিমাসির বর, অর্থাৎ, আমার সেজো মেসোর নাম তরুণ ঘোষ। বাপ-মায়েরা ছেলের নাম রাখার সময় খেয়াল করেন না যে, তরুণ নামের ছেলেরা এক সময় বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারে। যেমন আমার দাদার ডাক নাম খোকন, ওই নামে লোকজনের সামনে ডাকলে দাদা ভয়ংকর চটে যায়! রীতিমতো এক ক্লাস ওয়ান অফিসার, তার নাম খোকন!

যেমন আমার বন্ধু প্রিতমের ডাক নাম বুড়ো। এ নাম সে মোটেই পছন্দ করে না। এমনকী সে যখন সত্যিই বুড়ো হবে, তখনও পছন্দ করবে না। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়ার মতো বুড়োকে বুড়ো বলতে নেই!

আমার এই তরুণমেসো এক সময় সেনাবাহিনীর কর্নেল ছিলেন, যেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনই নাকের নীচে এক জবরদস্ত গোঁফ। মিলিটারিদের বোধহয় গোঁফ রাখতেই হয়। অবশ্য তাঁর সেই গোঁফ আর মাথার চুল, সব এখন সাদা। সাদা চুলের তরুণবাবু!

ঘাটশিলায় ওঁদের তিন পুরুষের বাস। মস্ত বড় বাগানওয়ালা বাড়ি, সঙ্গে একটা পুকুরও আছে। চার বছর আগে, ওঁদের মেয়ে অনসূয়ার বিয়েতে আমি এসেছিলাম। সে এখন স্বামীর সঙ্গে থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। তৃপ্তিমাসির দু'টি ছেলেই একেবারে রত্ন, পড়াশোনায় বরাবর ফার্স্ট-সেকেন্ড। আর পড়াশোনায় বেশি ভাল হলে যা হয়, সেই সব ছেলেরা আর দেশে থাকে না। একজন জার্মানিতে, অন্যজন সুইডেনে। দু'জনেই মেম বিয়ে করেছে। ওরা কি কখনও ঘাটশিলায় বসবাস করতে আসবে? অসম্ভব!

তা হলে এই মাসি-মেসোর অবর্তমানে এখানকার এত বড় বাড়ি কার ভোগে লাগবে? যাক গে, সে ভাবনা আমার নয়। তৃপ্তিমাসি আর তাঁর বর বহুদিন বেঁচে থাকুন, অমরও হতে পারেন!

মাসতুতো-পিসতুতো মিলিয়ে অতগুলো বোনের মধ্যে আমার মায়েরই শুধু বিয়ে হয়েছিল এক গরিবের সঙ্গে। কী করে যে মা অল্প বয়সে এক স্কুলমাস্টারের প্রেমে পড়লেন! আগেকার দিনের স্কুলমাস্টার, কোনও ব্যাঙ্কের দারোয়ানের চেয়েও কম মাইনে! তাও আবার মায়ের সেই স্কুলমাস্টার স্বামীর আয়ু ছিল অত কম। মা যখন বিধবা হলেন, তখন দাদার বয়স সতেরো, আমার দশ।

আমি মাঝেমাঝে ভাবি, রোম্যান্টিক প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে মা কেন এমন এক স্কুলমাস্টারকে বিয়ে করতে গেলেন? অল্প বয়সে মায়ের চেহারা সুন্দর ছিল, পড়াশোনাও করেছেন। কিছুদিন প্রেম করার পর হবু স্কুলমাস্টারের বদলে যোগ্যতর কোনও পাত্র বিয়ে করলেই পারতেন। তা হলে আর এতকাল আমাদের এই ভাড়া বাড়িতে বাড়িওয়ালার গঞ্জনা শুনে থাকতে হত না।

তারপরেই মনে পড়ে, সর্বনাশ, মা যদি আমার ইস্কুলমাস্টার বাবাকে বিয়ে না করতেন, তা হলে আমি থাকতাম কোথায়? আমি জন্মাতামই না? পৃথিবীতে আর সবাই আছে, শুধু আমি নেই, এ কি ভাবা যায়!

অনেকদিন পর মা একটা সিল্কের শাড়ি পরেছেন, বেশ দেখাচ্ছে। বয়সটাও যেন কমে গিয়েছে। কতই বা বয়স, ঊনষাট। এই বয়সে অনেক মহিলা ঠোঁটে লিপস্টিক দেয়!

আমি কল্পনা করলুম, সিল্কের শাড়ি পরে, ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে আমার মা হাই হিল পায়ে দিয়ে হাঁটছেন, চোখে সানগ্লাস...তখন কী আর মা বলে ডাকতে সাহস পাব?

কল্পনার মধ্যে হাসিতে শব্দ হয় না, কিন্তু সারা শরীর কাঁপে।

॥ ৩ ॥

ঘাটশিলায় আমি ঠিক কতদিন থাকব? মা একমাস-দু'মাস থেকে যেতে পারেন, কোনও অসুবিধে নেই। স্বাস্থ্যকর জায়গা, ভাল চেঞ্জও হবে। তৃপ্তিমাসির সে রকমই ইচ্ছে মনে হল।

তা বলে আমি কি অতদিন বাধ্য ছেলের মতো মা-মাসিদের আঁচলের ছায়ায় থাকতে পারব নাকি?

ভোর রাতে বন্দনাদিকে স্বপ্নে দেখলাম। তার মানে, দিকশূন্যপুর আমায় ডাকছে।

বন্দনাদির কাছাকাছি গিয়ে থাকলেই আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাই। বন্দনাদি আমার চেয়ে দশ-এগারো বছরের বড়। তবু আমি তার প্রেমিক। মাঝেমাঝে আলটপকা একটা চুমু দেয় বন্দনাদি, তখন মনে হয় জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। ন' মাসে-ছ' মাসে শুধু একটা চুমু, আর কিছু না, মনে হয়, তার বেশি আমি সহ্যও করতে পারব না!

মাকে এখানে রেখে আমি কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসতেও পারি।

ঘাটশিলা শহরটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিহার নয়, এখন ঝাড়খন্ড। টুরিস্ট আসছে অনেক, কয়েকটা হোটেলও হয়েছে। চওড়া রাস্তা চলে গিয়েছে দিগন্তের দিকে। আগেকার নিরিবিলি ভাবটা আর নেই, উন্নতি মানেই তো তাই।

দ্বিতীয় দিনে যে হোটেলটায় আমরা খেতে গেলুম, সেটি পুরনো হলেও নতুন সাজে সজ্জিত। বাড়ির দেওয়ালে নতুন রং।

হোটেলটির মালিক তরুণমেসোর বাল্যবন্ধু। হোটেলটির পাশেই মালিকের বাড়ি। সেখানে সপরিবার থাকেন। আমরা সে বাড়িতেই বসলুম, খাবার এল হোটেল থেকে। এ বাড়িতে নাকি রান্নার কোনও পাটই নেই, প্রত্যেক দিনই দু'বেলা সব খাবারদাবার হোটেল থেকেই আসে, ব্রেকফাস্ট পর্যন্তও। শুনে বেশ মজা লাগল। একটা বাড়িতে সাংসারিক সব কিছুই আছে, শুধু রান্নাঘর নেই। রান্নার চিন্তা নেই। বিরাট সুবিধে!

হোটেলের মালিক বিনায়ক ঝা, তাঁর স্ত্রী সুহাসিনী, দুই মেয়ে, দুই ভাগনে, আরও কয়েকজন, মোটামুটি বেশ বড়ই পরিবার। শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, গানবাজনা, গালগল্পও হল। একটি মেয়ে শোনাল দুটি হিন্দি, একটা বাংলা গান। আর-একটি ছেলে শোনাল একটি কৌতুকনকশা, যেটা শুনে একটুও হাসি পায় না।

আমাদের দিক থেকে তরুণমেসো আবৃত্তি করে শোনালেন,

বহু বছরের সেই চির পরিচিত 'বল বীর, চির উন্নত মম শির...' একজন প্রাক্তন সেনানায়কের পক্ষে এ কবিতা বেশ মানানসই। এবং আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, অনেক সাধাসাধির পর আমার মা-ও শুনিয়ে দিলেন একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত! আমি খুব ছোটবেলায় রান্নাঘরে মাকে গুনগুন করে গান গাইতে শুনতাম। তারপর অনেক বছর আর মা গলা খোলেননি। তৃপ্তিমাসি ফাঁস করে দিলেন যে আমার মা নাকি কিছুদিন গান শিখেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে।

মা-বাবার সব কথা ছেলেমেয়েরাও জানে না। ছেলেমেয়েদের সব কথা কি মা-বাবারাও জানে?

গলাটা একটু কেঁপে-কেঁপে গেলেও মায়ের এখনও যথেষ্ট সুরজ্ঞান আছে। মা গাইলেন, 'এই তো তোমার আলোকধেনু, সূর্য —তারা দলে দলে...' এ গানটা আমি অন্য কারও কণ্ঠেও অনেকদিন শুনিনি।

এই ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর খাওয়াদাওয়ার পর্বটিও অতি উত্তম হয়েছিল। পদগুলি নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য বিশেষভাবে রান্না হয়েছে। সুক্তো আর ঝিঙেপোস্ত যেমন আছে, তেমনই রুই মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর চিতল মাছের পেটি। এর সঙ্গেই আবার মাটন বিরিয়ানি রাখা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে, তা আর খাওয়া যায়নি। সবই খুব সুস্বাদু, আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে কাঁচা পেপের প্লাস্টিক চাটনি।

বিনায়ক ঝা মশাই খাওয়াদাওয়ার সময় আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়ন করেছিলেন। তবে হঠাৎ কথা বলতে-বলতে তাঁর এমন কাশির দমক এল যে, তিনি উঠে যেতে বাধ্য হলেন। কাশতে-কাশতে তাঁর শরীরটা দুমড়ে গেল, ভাল করে হাঁটতেও পারছিলেন না। একটি মেয়ে তাঁকে ধরে-ধরে নিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

ফিরতে-ফিরতে আমাদের বেশ রাত হয়ে গেল।

তবু তরুণমেসো প্রস্তাব দিলেন, শুতে যাওয়ার আগে এক কাপ করে কফি খাওয়া হোক।

অর্থাৎ, কফি উপলক্ষে আরও কিছুক্ষণ আড্ডা। সবাই মিলে বসা হল ড্রয়িং রুমে।

নানান কথার মধ্যে তৃপ্তিমাসি মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "দিদি, তোমার কেমন লাগল ওই পরিবারটাকে?"

মা বললেন, "বেশ চমৎকার মানুষ ওঁরা, এত ভদ্র ব্যবহার।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "ওঁরা এখানকার মানুষ হলেও বাঙালিয়ানা পুরোপুরি বজায় রেখেছেন।"

তরুণমেসো বললেন, "হোটেলের ব্যবসা, কিন্তু আর্ট-কালচারের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো আর সরস্বতীপুজো হয়।"

মা বললেন, "মেয়েটি বেশ ভাল গায়।"

তৃপ্তিমাসি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কেমন লেগেছে, নিলু!"

আমি বললুম, "খাবারদাবার বেশ ভাল ছিল।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "হোটেলের স্পেশ্যাল রান্না তো ভাল হবেই। আমি জিজ্ঞেস করছি, ওই ফ্যামিলিটার কথা।"

"মানুষগুলো বেশ।"

"আর ওই মেয়েটি?"

"কোন মেয়েটি? দু'জন মেয়ে ছিল।"

"যে মেয়েটি গান গাইল। ওর নাম রেবেকা, আবার ডাক নাম রাধা। যে-কোনও নামেই ডাকা যায়। দুটোই ভাল নাম।"

"বাঙালি মেয়ের নাম রেবেকা? বেশ নতুনত্ব আছে।"

"রেবেকাকে তোর কেমন লাগল, তাই বল।"

"ভালই তো। তবে গানের স্কেল ভুল করেছে।"

"মোটেই ভুল করেনি। তুই আবার গানের এত বোদ্ধা হলি কবে থেকে?"

মা বললেন, "আমাদের তো কানে লাগেনি। ঠিকই তো ছিল স্কেল।"

তরুণমেসো বললেন, "সুরে একটুআধটু ভুল গাইলেও পরে ঠিক করে নিতে পারে। সে আর বেশি কথা কী? সব মিলিয়ে মেয়েটি কেমন?"

আমি বললুম, "আমি শুধু ওর গান শুনেছি। সুতরাং সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আসছে কী করে?"

মা বললেন, "ব্যবহার। কথাবার্তাতেও অনেকটা বোঝা যায়। বেশ নম্র ভাব আছে।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "আমরা তো ওকে ছোটবেলা থেকে চিনি। অতি সুন্দর স্বভাব রেবেকার। ঝাবাবুর একমাত্র মেয়ে।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "একমাত্র মেয়ে? তা হলে অন্য মেয়েটি কে?"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "অন্য মেয়েটি, ওর নাম সেবা ও বিনায়কবাবুর পালিতা কন্যা। রেবেকার সঙ্গেই এক সঙ্গে বড় হয়েছে। নিজের মেয়ের মতো। রেবেকা গ্র্যাজুয়েট, গান জানে, সেলাইও ভাল শিখেছে।"

"এ যে বিয়ের পাত্রীর মতো কথা বলছ মাসি।"

"বলছিই তো। ওর বিয়ের সম্বন্ধ করছি।"

"কার সঙ্গে?"

"কার সঙ্গে আবার? তোর সঙ্গে!"

আমি তরুণমেসোর দিকে তাকিয়ে বললুম, "আপনার সামনে কোনও দিন সিগারেট খাইনি, আজ একটা খাব?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, খাও-খাও। নো প্রবলেম।"

সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বললুম, "মাসি, তুমি আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছ। সুকুমার রায়ের সৎপাত্র কবিতাটি পড়েছ?"

তরুণমেসো বললেন, "আমি বিক্রম শেঠের 'সুটেবল বয়' নামে নভেলটা পড়েছি।"

আমি বললুম, "ওটা পড়লে আমার সম্পর্কে কিছু জানা যাবে না।"

তৃপ্তিমাসি ধমক দিয়ে আমাকে বললেন, "বাজে কথা রাখ তো! তোকে আমরা চিনি না? যখন হামাগুড়ি দিতিস, কথা বলতেও শিখিসনি, তখন থেকে তোকে দেখছি। শোন, দিদি আর আমার দু'জনেরই তো বেশ পছন্দ হয়েছে রেবেকাকে। ওর বয়স এই সবে মাত্র চব্বিশ। তুই-ই তো বলেছিলি, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা চাস। তাই-ই তো পাচ্ছিস। এ যুগে যতটা সম্ভব! মেয়েটিকে দেখতে বেশ সুশ্রী, রং ফরসা, কত লম্বা চুল দেখেছিস? আর ওকে বিয়ে করলে তুই-ই এক সময় ওই হোটেলের মালিক হয়ে যাবি।"

"শোনো, মাসি..."

"চুপ কর, আগে আমাকে সবটা বলতে দে। রেবেকার একজন বড় ভাই ছিল, গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা যায়। খুবই ট্র্যাজিক ব্যাপার। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। বিনায়কবাবু তো এখনও সুস্থ নন। অমন জলজ্যান্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে! বিনায়কবাবুও বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিতে চান। আমাদের সাহায্য চেয়েছেন। আমাদের হাতের কাছেই তো পাত্র আছে তৈরি। তুই!"

"মাসি, এবারে আমাকে কথা বলতে দাও। তোমরা রাজি হলেও ওঁরা আমার মতো একটা গুড ফর নাথিং ছেলেকে পছন্দ করবেন কেন? অনেক ভাল পাত্র পেতে পারেন।"

"ওঁরা কী চেয়েছেন, শোন! পাত্র বেশি লেখাপড়া জানা হলে চলবে না! বেশি লেখাপড়া জানলে হোটেলের ব্যবসায় মন দেবে না। এই
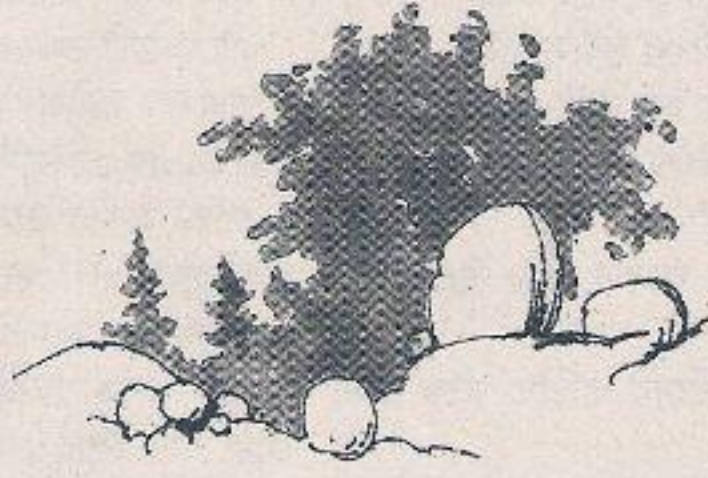
ছোট জাতের [illegible] চাইবে না। খুব সুন্দর চেহারার পাত্রও ওঁরা চান না। সুন্দর চেহারার পুরুষরা সাধারণত লোভী হয়। অন্য মেয়েদের কাঁদে চট করে পা দিয়ে ফেলতে পারে। খুব উচ্চবংশের ছেলেও ওদের দরকার নেই। কারণ, রেবেকার মা ব্রাহ্মণের মেয়ে নন। তাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট হতে পারে। তোর সঙ্গে কীরকম টায়-টায় মিলে যাচ্ছে দ্যাখ। তা হলে বল, দিন ঠিক করি।"

তরুণমেসো বললেন, "এই বিয়েটা হলে কত ভাল হয় বলো তো! তুমি আমাদের কাছাকাছি থাকবে। তোমার মা-ও এখানে থাকতে পারবেন।"

মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, মুখখানায় চাপা খুশির ভাব মাখা। আমি বললুম, "যদি বিয়ে করতেই হয়, তা হলে আমি অন্য মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি আছি। ওই যার নাম সেবা।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? কেন, ওই সেবাকে কেন তোর পছন্দ হল?"

"কারণ, রেবেকাকে বিয়ে করলে সবাই বলবে, আমি একটা হোটেলের মালিক হওয়ার লোভে এই কাণ্ডটা করেছি।"

"সবাই মানেটা কী! কেউ বলবে না। তুই তো আর জোর করে বিয়ে করছিস না। ওরাই চাইছে। সুহাসিনী আমাকে বলেছে। তোকে ওদের খুব ভাল লেগেছে। তা ছাড়া সেবার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে আগেই। ওর স্বামীটা এখন জেল খাটছে। তা বলে তো ওর আবার বিয়ে হতে পারে না।"

"মাসি। সারাজীবন আমাকে হোটেলের খাবার খেতে হবে?"

"ভ্যাট। যত সব পাগলের মতো কথা। সে তুই ইচ্ছে করলে... শোন, রেবেকা সত্যি ভাল মেয়ে। ওকে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি। তোর বাউণ্ডুলেপনাও বন্ধ হবে। রেবেকাকে না হয় আমি কয়েকটা রান্না শিখিয়ে দেব। তোর জন্য আলাদা করে লাউঘন্ট, মোচার তরকারি, পুঁটি মাছের টক, যা হোটেলে পাওয়া যায় না..."

মা বললেন, "ওর রেবেকা নামটা আর দরকার নেই। রাধাই তো ভাল।"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "ঠিক বলেছ, আমাদের বাড়িতে ওকে রাধা বলেই ডাকব।"

আমি বললুম, "তা হলে আমারও নাম দিয়ে দাও কেষ্ট। কাল থেকে বাঁশি বাজানো শিখব।"

তৃপ্তিমাসি উঠে এসে আমার মাথায় একটা মিষ্টি চাঁটি মেরে বললেন, "সব কথাতেই ইয়ার্কি। দ্যাখ না। তোর এই মাথাতে আমি টোপর পরিয়ে ছাড়ব।"

তরুণমেসো বললেন, "তা হলে আর দেরি করে লাভ কী। শীঘ্রস্য শুভম, না কী যেন বলে!"

মা বললেন, "কাল থেকে চৈত্রমাস পড়ে যাচ্ছে। এ মাসে কি বিয়ে হয়?"

তৃপ্তিমাসি বললেন, "ওসব এখন আর কে মানে! রেজিষ্ট্রি তো হয়ে যাক। রেজিষ্ট্রি বিয়েতে শুভদিন লাগে না।"

॥ ৪ ॥

আমি ঘাটশিলায় কখনও একটানা বেশিদিন থাকিনি।

এখান থেকে চলে গিয়েছি ধলভূমগড় কিংবা কিরিবুরু। একবার চিলবিগড়ে ছিলুম টানা কয়েক সপ্তাহ। ছোটখাটো কম চেনা জায়গা আমার বেশি ভাল লাগে।

ঘাটশিলায় বেশির ভাগ মানুষই আসে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। এখানকার জল নাকি সব হজম করিয়ে দেয় আর খিদে বাড়ায়। সেইজন্যই আমি এখানে জল খুব কম খাই। আর কত খিদে বাড়াব, শেষ পর্যন্ত না নিজের নাড়িভুঁড়িই হজম করে ফেলতে হয়।

জায়গাটায় তেমন নাম করা দ্রষ্টব্য স্থান বিশেষ নেই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প পড়ার পর রঙ্কিনী দেবীর মন্দির দেখলেই আমার ভয় করে। তবে দূরে দূরে পাহাড় ঘেরা [illegible] টিলা অতি মনোরম। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সন্ধেবেলা কিছুক্ষণ বসে থাকাও বেশ রোমাঞ্চকর। দিনেরবেলা এই নদী আর সন্ধের সময়ের নদীর অনেক তফাত। আধো অন্ধকারে রূপকথার প্রাণীরা এই নদীর জলে নামে।

আর ফুলডুংরি পাহাড়ে তো একবার যেতেই হয়। ভোরে কিংবা শেষ বিকেলে। ভোরে ঘুম ভাঙে না। আমার পক্ষে বিকেলই ভাল।

একটা পাথরের উপর বসে প্রকৃতি দর্শন করতে-করতে ফুসফুসে ঢোকাচ্ছি বিষাক্ত ধোঁয়া, মিনিট পনেরো কেটেছে, এমন সময় পিছন থেকে কেউ বলল, "নমস্কার।"

এ যেন সিনেমার দৃশ্য! টিলার উপর নায়কের সঙ্গে নায়িকার হঠাৎ দেখা।

হঠাৎ মোটেই নয়। পূর্ব পরিকল্পিত অনেকটা।

তৃপ্তিমাসি আমাকে বারবার করে বলছিলেন হোটেল মালিকের মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসতে।

সেটা কি আমার পক্ষে সম্ভব নাকি?

একা-একা যাব একটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে, আর আড়াল-আবডাল থেকে উঁকি মারবে তার আত্মীয়স্বজন? সম্বন্ধ করা বিয়ে, তার উপর একটুখানি আধুনিকতার প্রলেপ লাগানো।

আমি যে এখন এই পাহাড়ে আছি, তা আমার মা-মাসিরা জানেন। তরুণমেসোর গাড়িই আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। মাসি নিশ্চয়ই খবর পাঠিয়েছেন হোটেলের মালিককে। তাঁরও গাড়ি আছে।

এই মেয়েটি এখন রাধা, না রেবেকা!

রাধা নাম শুনলেই মনে হয় এক সলজ্জ নারী। রেবেকা নাম শুনলে মনে হয় এক রোগাসোগা মেয়ে, মুখে ইংরেজির ফুলঝুরি ফোটে।

যেদিন আমরা ওদের বাড়ি খেতে যাই, সেদিন মেয়েটি অনেকটা রাধাভাবেই ছিল। গান গেয়েছে বটে, কিন্তু কথা বিশেষ বলেনি, দৃষ্টি নত করে ছিল, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়নি একবারও।

আজ তাকে রেবেকা বলেই মনে হয়। জিন্সের উপর স্লিভলেস জামা, তার উপর একটা পাতলা শাল আলগা করে জড়ানো। আমি যথারীতি পাজামা আর নীল পাঞ্জাবি, গরম কিছু আনিনি। একটু শীত-শীত করছে।

মুখ ফিরিয়ে বললুম, "নমস্কার। আপনি এখানে? এ জায়গাটা নিশ্চয়ই একশো সাতাশবার দেখা?"

রেবেকা বলল, "তার বেশি বারও হতে পারে। আজ তো এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।"

সিনেমারই মতো একটা ডায়লগ দিয়ে আমি বললুম, "সে তো আমার সৌভাগ্য," এ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেত!

সন্ধে হতে খানিকটা দেরি আছে। সূর্যাস্ত দেখার অপেক্ষায় এখনও বেশ কিছু টুরিস্ট রয়েছে উপরে। প্রায় সকলেই ক্যামেরা বাগিয়ে আছে। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মোবাইল ফোনের নানারকম আওয়াজ।

আমার এই দিকটা তবু একটু ফাঁকা। একটু দূরে আর-একটা পাথরে বসে আছে একজোড়া যুবক-যুবতী। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, একটু অন্ধকার হলেই ওরা চুমু খাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

আমি রেবেকাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি এখানে বসবেন?"

উত্তর না দিয়েই রেবেকা বসে পড়ল আমার পাশে। আমি সিগারেটটা ফেলে দিলুম হাত থেকে। এত ছোট হয়ে এসেছিল যে প্রায় পুড়িয়ে দিচ্ছিল আঙুল। খেয়ালই করিনি।

কথা খোঁজার জন্য একটু ক্ষণের নীরবতা। দু'জনেরই।

তারপর আমি কথার কথা হিসেবে বললুম, "এ জায়গাটা থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়, ভারী সুন্দর লাগে।"

এর উত্তরে রেবেকা যা বলল, তা মোটেই সিনেমার ডায়লগ হতে পারে না। সে বলল, "আপনি কি সুট পরে বিয়ে করতে যাবেন?"

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে বললুম, "সুট পরে বিয়ে? তার মানে?"

রেবেকা বলল, "এদিককার অনেক লোক সেইভাবে যায় তো বিয়ে করতে। সুট পরে [illegible] টোপরও দেয়। আমার বাবা আপনার জন্য সুট বানানোর অর্ডার দিয়েছেন।"

আমি বললুম, "আমার সুট? মাপ পেলেন কী করে?"

রেবেকা একটা হাসিতে আমাকে পরাজিত করে দিয়ে বলল, "এটা কি একটা প্রশ্ন হল? মাপ পাওয়াটা কী আর এমন শক্ত ব্যাপার!"

সত্যিই এরকম একটা সাধারণ প্রশ্ন করা আমার উচিত হয়নি।

এটা সামলাবার জন্য আমি আবার একটা বোকার মতো কথা বললুম, "আপনার বাবা আমার জন্য সুট বানাবেন কেন?"

"আহা হা, আপনি জানেন না বুঝি, ফাদার ইন ল'রাই তো ব্রাইডগ্রুমের জামাকাপড় দেন। সুট ছাড়াও গরদের কুর্তা, গরদের ধুতি..."

মেয়েটা আমাকে একেবারে চুপসে দিচ্ছে।

ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান একেবারে চুপসে দিচ্ছে।

ব্যক্তিত্ব ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য আর-একটা সিগারেট ধরানো দরকার। জিজ্ঞেস করলুম, "ডু ইউ মাইন্ড, ইফ আই স্মোক?"

"নট অ্যাট অল।"

"আপনারা ধরেই নিচ্ছেন যে... তার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

"আমরা ধরে নেব কেন? এর মধ্যে হোল ঘাটশিলা জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে, আপনার সঙ্গে আমার..."

"দাঁড়ান, দাঁড়ান! আমার কয়েকটা কথা আপনার জানা দরকার।"

আপনি আগে আমার সম্পর্কে কিছু জানুন। মিস্টার নীললোহিত, আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন। কিন্তু আমি বেশ খারাপ মেয়ে।"

"তাই নাকি?"

"ইয়েস। আমি বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই প্রেম করি। অনেকের সঙ্গে। দু'জনের সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশনসও হয়ে গিয়েছে। আপনাকে এসব সত্যি কথা আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি।"

"আমাকে এসব কথা না জানালেও চলত।"

"পরে অন্যর কাছ থেকে জানার চেয়ে... আমাদের হোটেলে কয়েকজন রেগুলার কাস্টমার আসে আমার অ্যাট্রাকশনে। বাবা-মা জানতে পারেন না, আমি রাত্তিরে তাদের ঘরে যাই। তাদের সঙ্গে বিছানায় যাই না। তবে তাদের সঙ্গে আড্ডা মারি। ড্রিঙ্ক করি।"

"আপনি ড্রিঙ্ক করেন? বাঃ!"

"আমি খুব স্মোকও করি। আপনার একটা সিগারেট দেবেন?"

"নিশ্চয়ই। মেয়েদের সিগারেট টানতে দেখলে আমার ভাল লাগে। তখন গালে টোল পরে।"

"আমার মা-বাবা আমাকে সামলাতে পারেন না, তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাইছেন। যে-কোনও এলেবেলে পাত্রের সঙ্গে। অফ কোর্স সেই পাত্রকে ঘরজামাই হতে হবে। সে হোটেল সামলাবে। তবে, আর-একটা কথাও জেনে রাখা ভাল। আমাকে বিয়ে করলেও কিন্তু আপনি ওই হোটেলের মালিক হতে পারবেন না। কর্মচারী হয়ে থাকবেন। ওই হোটেলটা আমার নামে উইল করা আছে। অর্থাৎ, আপনাকে আমার অর্ডার অনুযায়ী চলতে হবে।"

"বাঃ।"

"বাঃ মানে?"

"এইবার আমার কথা শুনবেন?"

"আপনার কিছু বলার আছে, বলুন!"

"আপনি আমাকে মিস্টার নীললোহিত বললেন। আমি মিস্টার নই, শুধু নীললোহিত। আমি জীবনে কখনও সুট পরিনি। সুট মানে তো এক [illegible] প্যান্ট আর কোট আর টাই? না পরিনি।"

"এবার থেকে পরবেন। হোটেলের ম্যানেজার হতে গেলে।"

"আমি ইংরেজি বলতে পারি না। দু'বারের চেষ্টাতেও গ্র্যাজুয়েট হতে পারিনি।"

"আপনার মাসি যে বলেছেন, আপনি গ্র্যাজুয়েট?"

"বাড়িয়ে বলেছেন। আমি আসলে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট। হাজার চেষ্টা করেও কোনও চাকরি পাইনি। কোনও মেয়ে আমাকে পাত্তা দেয়নি। সবাই আমাকে বলে ভ্যাগাবন্ড। আমার ডাকনাম ক্যাবলা।"

"তাই নাকি? বাংলায় ক্যাবলা মানে কী যেন?"

"গুড ফর নাথিং। ইডিয়েটও বলতে পারেন। কী করব, আমি এই রকমই! ছোটবেলায় মাথায় একটা চোট লেগেছিল, তাই আর কিছুই ঠিকঠাক মনে রাখতে পারি না। মুখ দিয়ে লালা পড়ে।"

"যাঃ! হি হি হি!"

"আপনি হাসছেন মিস রেবেকা? তা হলে আর-একটা কথা বলি, আমি না একসময় মেয়ে হয়ে গেসলুম!"

"কী?"

"ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে গেসলুম। আবার অবশ্য এখন ছেলে হয়েছি, কিন্তু কবে যে আবার মেয়ে হয়ে যাব, তার ঠিক নেই!"

"যাঃ, তা আবার হয় নাকি?"

"হ্যাঁ, মা কালীর দিব্যি, হয়েছি তো! মেয়ে হয়ে থাকতেই আমার বেশি ভাল লাগে। বলুন আমার কি কোনও মেয়েকে বিয়ে করা উচিত?"

রেবেকা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর হেসে উঠল খুব জোরে। আমিও যোগ দিলুম তার হাসির সঙ্গে।

হাসতে-হাসতে রেবেকা বলল, "আপনি ধরা পড়ে গেলেন কখন জানেন? যখন আপনি বললেন, আপনার মুখ দিয়ে লালা পড়ে। ওটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। যাদের মুখ দিয়ে লালা পড়ে, তাদের চোখ হয় ঘোলাটে।"

আমি বললুম, "আর আপনি কখন ধরা পড়লেন? যখন আপনি বললেন, আমি খুব স্মোক করি, তারপরই সিগারেট ধরিয়ে তিনবার কাশলেন! বোঝাই যায়, একেবারে নভিস! আপনি তো ড্রিঙ্কও করেন? কী-কী খান?"

"বিয়ার, রাম।"

"ক' পেগ বিয়ার খান?"

"পেগ? অন্তত তিন পেগ না হলে চলে না!"

"বাঃ! আর রাম তো একসঙ্গে কয়েক বোতল খেতে হয়। আপনার ক' বোতল লাগে?"

"অ্যাট লিস্ট ছ' বোতল!"

"তা হলে তো আপনার মদ্যপানের অলিম্পিকে যোগ দেওয়া উচিত। একসঙ্গে ছ' বোতল রাম খেলে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হবেই।"

"ছোট-ছোট বোতল।"

"কত ছোট? হোমিওপ্যাথির ওষুধের শিশির মতো?"

"অতশত জানি না। এবারে বলুন তো, আপনার মেয়ে হয়ে যাওয়াটা কী ব্যাপার?"

"আমি সত্যিই মাঝেমাঝে মেয়ে হয়ে যাই।"

"ভ্যাট, বাজে কথা। দেখি আপনার হাতটা।"

বাড়িয়ে দিলাম এক হাত। রেবেকা আমার করতল ধরল তার দু'হাতে। এই অবস্থায় কেউ আমাদের ছবি তুলে নিলে নির্ঘাৎ মনে

হবে, আমরা খুব প্রেম করছি।"
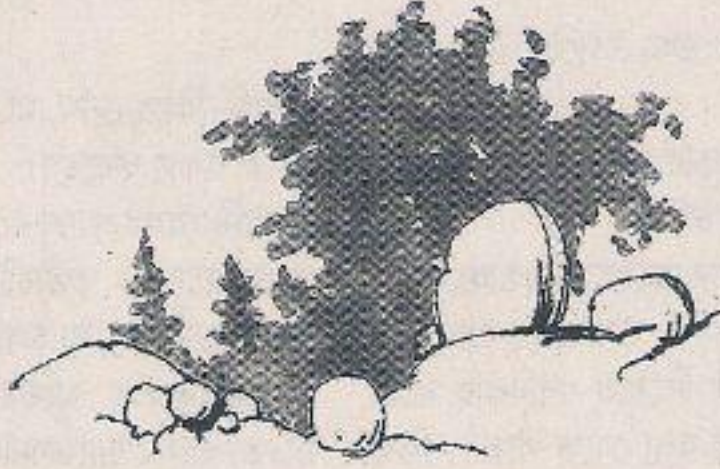
রেবেকা বলল, "মোটেই মেয়েলি নয়। এ হাত তো কাঠের মিস্তিরিদের মতো।"

"কাঠের মিস্তিরিদের হাত স্পেশ্যাল কিছু হয় নাকি?"

"হবে না? যেমন যারা পোয়েট্রি লেখে, তাদের হাতের তেলো হয় আলুসেদ্ধর মতো।"

"বেশ নতুন ধরনের নাম শুনলুম। এবারে আপনার হাতটা আমি একবার দেখতে পারি? যদি কিছু মনে না করেন।"

"না। আমার হাত দেখার কোনও দরকার নেই। আমি তো বলিনি যে, আমি মাঝেমাঝে পুরুষ হয়ে যাই! যত সব মিথ্যে কথা!"

"আপনার সঙ্গে মিথ্যে কথায় পাল্লা দিতে গেলে আমি হেরে ভূত হয়ে যাব!"

"যাই হোক। প্রমাণ হয়ে গেল, আমি আর আপনি, দু'জনই দু'জনের অযোগ্য! সুতরাং এ বিয়ে হওয়ার আর প্রশ্ন নেই।"

"গুড!"

"গুড মানে?"

"গুড মানে, চুকে গেল ঝামেলা। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।"

"আপনি বুঝি মাথা ঘামাচ্ছিলেন খুব?"

"রেবেকাদেবী, আপনি কি ল' পড়েছেন নাকি? আমাকে উকিলি জেরা করছেন কেন? যে-কোনও জিনিস মাথার মধ্যে ঢুকলেই তো একটুআধটু মাথা ঘামে। খুব মাথা ঘামাবার কথা তো বলিনি। ব্যাপারটা চুকে গেল, এটাই তো যথেষ্ট।"

"আপনি আমার সঙ্গে এমন গলা চড়িয়ে কথা বলছেন কেন? ইউ হ্যাভ নো রাইট টু স্পিক লাইক দ্যাট!"

"এই রে, এবার কি ঝগড়া হবে নাকি? তার দরকার নেই। আমার গলা যদি চড়ে ফ্যালে! সে জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।"

একটুক্ষণ নীরবতা। দু'জনেই সোজা সামনে তাকিয়ে। এতক্ষণে শুরু হয়েছে সূর্যাস্ত। অল্প-অল্প মেঘ আছে আকাশে। তার স্তরে-স্তরে গাঢ় রক্তিম আভা। দূরের পাহাড়গুলোকে ঢেকে দিয়েছে যবনিকার মতো ছায়া। এটাকে বেশ একটা রোম্যান্টিক মুহূর্ত বলা যেতে পারত। কিন্তু পাশাপাশি বসে আছি আমার দুই গোমড়ামুখো।

মিনিট দু'-এক পর রেবেকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে এবার যেতে হবে। আপনার সঙ্গে আলাপ হল...ইয়ে, মনে হয়, আপনার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না।"

আমি বললুম, "আপনার সঙ্গেও আলাপ করে, হ্যাঁ, ভালই লাগল। না, আর আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি কি এখন আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব? নাকি তার দরকার নেই?"

রেবেকা বলল, "ওসব ফর্মালিটির কোনও দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারব।"

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে রেবেকা থমকে দাঁড়াল।

একটু চিন্তিতমুখে বলল, "নীললোহিতবাবু, আপনাকে একটা ফাইনাল কথা জানিয়ে যাওয়া দরকার। আপনার ভালর জন্যই। আপনার সঙ্গে আমার আজ যে কথা হল, আশা করি, তা আপনি আমার বাবা-মাকে জানাবেন না।"

আমি বললাম, "জানাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

রেবেকা বলল, "তবু বলছি। আমার মা-বাবার কথা শুনে আপনি যদি আবার বিয়েতে রাজি হন, তা হলে আপনার খুবই বিপদ হবে। এমনকী আপনি খুনও হয়ে যেতে পারেন!"

আমি কৃত্রিম ভয়ের ভাব দেখিয়ে বললুম, "ওরে বাবা, সে আবার কী! এর মধ্যে আবার খুন-জখমের কথা আসে কী করে? কে খুন করবে, আপনি?"

"না, আমি কেন খুন করতে যাব? ইন ফ্যাক্ট আপনি খুন হলে আমার খারাপই লাগবে। কিন্তু আমি আটকাতে পারব না। আপনাকে খুন করবে অরিন্দম মাহাতো।"

"সে আবার কে?"

"আপনি তাঁর নাম শোনেননি? সবাই চেনে, একজন বিশিষ্ট পলিটিক্যাল লিডার। তিনি আপনার চেয়ে অনেক ভাল বাংলা জানেন।"

"আমি খুব ভাল বাংলা জানি, এমন কি ক্লেম করেছি? যাই হোক, আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় নেই। হঠাৎ তিনি আমাকে খুন করতে যাবেন কেন? ওঃ, বুঝেছি, তিনি আপনার, ইয়ে, মানে, প্রেমিক! আপনি তাকেই বিয়ে করতে চান?"

"আমার সঙ্গে বিয়ে হোক বা না হোক, অন্য কেউ আমাকে কেড়ে নিতে চাইলে তিনি সহ্য করবেন না। সঙ্গে-সঙ্গে খতম করে দেবেন।"

"শুনুন রেবেকা, আমাকে যারা চেনে, তারা এইটুকু অন্তত জানে যে, নীললোহিতের আর যতই দোষ থাক, সে মোটেই বিয়েপাগলা নয়। আর আমার, ইয়ে প্রেমের জন্য খুন হওয়ার একদম ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া প্রেম তো হলই না, হবেও না।"

"মোটকথা, ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

এবার সে টকটক করে হেঁটে উঠে গেল উপরের দিকে।

আমার কিছুটা সময়ের গ্যাপ দিয়ে ওঠা উচিত। যাতে আর পরস্পরের মুখদর্শন না হয়।

বেশ তেজি মেয়ে। যে ওকে বিয়ে করবে, তাকে প্রায়ই সূক্ষ্ম তারের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। গুড লাক, অরিন্দম মাহাতো!

॥৫॥

বাড়ি ফিরে দেখি, মা, মাসি আর মেসো খাবার টেবিলে বসে বিয়ের চিঠির খসড়া করছেন।

আমি ওঁদের পাশে বসে বুঝতে পারলুম, এর মধ্যে দু'টি খসড়া ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। তৃতীয়টি লেখার চেষ্টা চলছে, মতভেদ হচ্ছে ভাষা নিয়ে। সাধুভাষা, না চলতি ভাষা?

তরুণমেসোর অভিমত যে, বিয়ের চিঠি সাধু বাংলাতেই লেখা উচিত। যেমন ট্র্যাডিশনাল হয়। তৃপ্তিমাসি বললেন, " দুর, দুর, ওই সব ভাষা পড়লেই এখন হাসি পায়। 'পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইবে', বিয়েটা কি একটা বন্ধন নাকি?"

তরুণমেসো বললেন, "বন্ধন না? কথায় যে বলে, সাতপাকে বাঁধা!"

মাসি বললেন, "ওসব ধারণা এখন অবসলিট হয়ে গিয়েছে। বন্ধন নয়, মিলন, মিলন! বন্ধন হলেই তা ছিঁড়তে ইচ্ছে করে..."

মেসো বললেন, "আর মিলনের অপজিট হচ্ছে বিচ্ছেদ, তাই না?"

মা বললেন, "নিলুর বন্ধুবান্ধবরা আধুনিক ভাষাই পছন্দ করবে। কী রে, নিলু তাই না?"

যে বিয়ে হবেই না, সে বিয়ের কার্ডের ভাষা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়!

কিন্তু এখনই ওঁদের সুসংবাদটা জানাই কী করে? মানে, সুসংবাদ আমার পক্ষে, ওঁদের পক্ষে নিশ্চিত দুঃসংবাদ!

এই কয়েকদিন মায়ের মুড বেশ ভাল আছে। একটানা এমন হাসিখুশি ভাব অনেকদিন দেখিনি। কলকাতায় মাঝেমাঝেই মায়ের মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ে। বড়ছেলের সংসারে থাকাটাই বোধহয় তেমন সুখকর নয়। দাদা কখনও মায়ের অযত্ন করবে না, মা কত কষ্ট করে দুই ছেলেকে মানুষ করেছেন, তা কি দাদা কখনও ভুলে যেতে পারে? তবে, দাদার কোনও কিছু নিয়ে আদিখ্যেতা করা স্বভাব নয়। প্রতিদিন মায়ের চরণামৃত পান করবে, সে টাইপই নয়। অনেকসময় মায়ের সঙ্গে কথা বলতেই ভুলে যায়। আবার কখনও মা পুজোটুজো নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে দাদা বকুনিও দেয়।

বউদিও মানুষ খারাপ নয়। শাশুড়ি আর বউয়ের ঝগড়া কখনও হয়নি আমাদের বাড়িতে। তবে মাঝেমাঝে মতভেদ তো হতেই পারে।

সেরকম সময় আমি একটা চাপা টেনশন টের পাই।

এখানে মা একেবারে টেনশন মুক্ত। ছোটছেলের বিয়ে হবে, এই [illegible] প্রতি মেয়েদের আগ্রহ খুব বেশি, বিয়ের পর কী হবে, সে চিন্তা মাথায় আসে না।

আজ সন্ধ্যায় রেবেকার সঙ্গে ওইসব কথাবার্তা না হলেও আমি কি এক হোটেল-মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে ঘাটশিলায় বাঁধা পড়ে থাকতাম? পাগল নাকি! টুক করে একদিন কেটে পড়ার প্ল্যান ছকেই ফেলেছিলাম। শুধু মায়ের ওই খুশিখুশি ভাবটা দেখার জন্যই পিছিয়ে দিচ্ছিলাম দিনটা। আমি তো আর দাদার মতো মায়ের সুপুত্র নই। মাকে আনন্দ দেওয়ার বদলে উদ্বেগের মধ্যেই রেখেছি বছরের পর বছর। এখানে অন্তত দু' চারটে দিন স্বপ্ন দেখুক।

এখন অবশ্য আমার কেটে পড়া বা না-পড়া অবান্তর। পাত্রীই এ বিয়েতে রাজি নয়। নারী-স্বাধীনতার জোয়ার চলছে, এর মধ্যে কোনও মেয়ের অমতে তাকে বিয়ে করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এ বিয়ের ব্যাপারে আমি ইচ্ছেপ্রকাশ করলেই আমাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তা খুব হালকাভাবেও নেওয়া যায় না। এখানে-সেখানে যখন-তখন খুনোখুনি তো চলছেই। অনেক রাজনৈতিক খুনের পিছনেও নারীঘটিত ব্যাপার থাকে কিনা কে জানে!

শেষ পর্যন্ত চলতি ভাষাতেই লেখা হল বিয়ের চিঠির বয়ান। কাল রবিবার, তারপরের দিনই প্রেসে পাঠানো হবে। যাক, তবু আর-একটা দিন সময় পাওয়া গেল! এরপর নেমন্তন্ন যাদের করা হবে, তাদের নামের লিস্ট।

আমাদের দিক থেকে পঁচিশজন থাকবে, না চল্লিশজন, এই নিয়ে আলোচনা চলে কিছুক্ষণ। দিল্লির মিলিমাসি কি আসবে? কানপুরের কাকা-কাকিমা? বউদির বাপের বাড়ির লোকদের কি বাদ দেওয়া হবে?

আমার মনে হল, ফাঁসির আসামি যখন চূড়ান্ত মৃত্যুদণ্ড শোনে, তখন তার মনের ভাব কেমন হয়!

নাঃ, আমার এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। পুরো ব্যাপারটাই তো আজগুবি। যে বিয়ে হচ্ছেই না, তার আবার নেমন্তন্ন! কাল-পরশুর মধ্যেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

মা হঠাৎ বলেন, "তুই আর এখানে বসে থেকে কী করবি। তুই তোর ঘরে যা।"

এবার বোধহয় গয়নাগাঁটি কেনার কথাবার্তা হবে!

আমি বাইরে বেরিয়ে বাগানের একটা বেঞ্চে বসলুম।

আজ মস্ত বড় একখানা চাঁদ উঠেছে। কলকাতার তুলনায় মফস্সলের চাঁদ একটু সাইজে বড় হয় এমনিতেই। তাই জ্যোৎস্নাও বেশি। ফিনফিনে হাওয়ায় ফুলগাছগুলো ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে।

একা হয়ে একটু বসতে না-বসতেই মনে পড়ছে রেবেকার মুখ। জ্যোৎস্না রাতে ফুলবাগানে বসলে প্রেমিকার মুখ মনে পড়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কী মুশকিল, রেবেকা তো আমার প্রেমিকা নয়, বরং উলটো। তার দিকে একটু ঝুঁকলে সে খুনের হুমকি পর্যন্ত দিয়ে গিয়েছে!

রেবেকার মুখখানা সরিয়ে মনের মধ্যে অন্য কোনও মেয়ের মুখচ্ছবি আনার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছুতেই রেবেকার তেজি মুখখানা মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত তাকে জব্দ করার জন্য আমি মনে-মনে মাদার টেরেসার ধ্যান করতে লাগলুম। এই মহিমাময়ী নারীর মুখের পাশে আর কোনও মেয়েই পাত্তা পাবে না।

আমার ধ্যানের জোরে অবিলম্বে মাদার টেরেসা আবির্ভূতা হলেন সশরীরে! মৃদু সুমিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস, কী তোমার মনের দুঃখ?"

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, "দুঃখটুঃখ তো কিছু নেই। এমনি বসে বসে জ্যোৎস্নাপান করছি।"

বলার পরই মনে হল, ভাষাটা ঠিক হল না। জ্যোৎস্নাপান আবার কী? চাঁদের কিরণসুধা পান বললে ঠিক মানানসই হত।

মাদার টেরেসা অবশ্য আমার ভাষার ভুল গ্রাহ্য করলেন না। তিনি বললেন, "নিজের দুঃখের বদলে জগতের দুঃখের কথা ভাবো। কত মানুষ আর্ত, বিপন্ন..."

বাণীটি শেষ করার পর তিনি ডান হাতের বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে বললেন, "শোনো বৎস, তোমাকে আমি একটা বর দিচ্ছি।"

বরটা আর শোনা হল না। প্রবল গর্জন করে গেটের সামনে একটা মোটরবাইক এসে থামল।

তার থেকে নেমেই একটি লোক ছুটতে-ছুটতে এল ভিতরে। লোকটিকে চেনা-চেনা লাগছে। 'পারিজাত' হোটেলের সহকারী ম্যানেজার, আগেরদিন আমাদের খাওয়াদাওয়ার তদারকি করছিল। খুব সম্ভবত এর নাম দিবাকর।

সে উর্ধ্বশ্বাসে বললে, "ত- ত- ত তরুণবাবু কোথায়?"

আমি বললুম, "ভিতরে আছেন। কী ব্যাপার আপনি হাঁপাচ্ছেন কেন?"

দিবাকর বলল, "খুব দরকার। সা- সা- সা- সা- সাংঘাতিক কা- কা- কাণ্ড হয়েছে!"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "সাংঘাতিক কাণ্ড? কী হয়েছে?"

দিবাকর বলল, "আজ স- স- স- স"

"আস্তে বলুন না!"

"বলছি-বলছি! আজ স- স- স- স"

তোতলামি একটা শারীরিক বিচ্যুতি মাত্র। সে জন্য কোনও মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কোনও জরুরি সংবাদ দেওয়ার জন্য কি তোতলা ব্যক্তি উপযুক্ত হতে পারে?

আগেরদিনই ওর তোতলামি লক্ষ করেছিলাম। তবে এতটা ছিল না। আজ কোনও কারণে বেশি উত্তেজিত হয়ে একেবারে লাগামছাড়া হয়ে গিয়েছে। 'স'-একেবারেই পারছে না।

তাকে ভিতরে এনে জলটল খাইয়ে শান্ত করার পর যা জানা গেল, তা সত্যিই সাংঘাতিক। তাতে স্বাভাবিক মানুষেরও তোতলামি শুরু হয়ে যেতে পারে।

সাংঘাতিক আর সন্ধেবেলা এই দু'টো শব্দই বেশি আটকাচ্ছিল দিবাকরের। মোট কথা, আজ সন্ধের একটু পরেই সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে ওদের হোটেলে এবং মালিকদের বাড়িতে।

জিপগাড়িতে এসেছিল চারজন ডাকাত, মুখে কালো কাপড় বাঁধা, প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। হোটেলে একজন গার্ড থাকে, প্রথমে তাকে বেঁধে ফেলে তার বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। তারপর দোতলায় এসে মালিককে খুঁজেছে। উপর থেকে ডাকাতদের দেখেই বিনায়কবাবু ভয় পেয়ে লুকোতে গিয়ে আর জায়গা না পেয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েছিলেন। ডাকাতদের বেশি খুঁজতে হয়নি, একজন বেয়ারাকে দু'টো থাপ্পড় মারতেই সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাথরুমের দরজার দিকে।

বাথরুমের দরজা ভাঙতে হয়নি। ছিটকিনিটা আলগা ছিল, (অনেকদিন থেকেই আলগা, সারানো আর হয়ে উঠছিল না, জোরে ধাক্কা দিতেই টক করে শব্দ হয়ে খুলে যায়। এই অকিঞ্চিৎকর তথ্যটি না জানালেও চলত, কিন্তু এটা বলতেই দিবাকর দেড় মিনিট সময় নিল) যাই হোক, বিনায়কবাবুকে বের করে তাঁর কপালে রিভলভার ঠেকাতেই তিনি আলমারির চাবি দিয়ে দিলেন। সেখানে বেশি টাকা
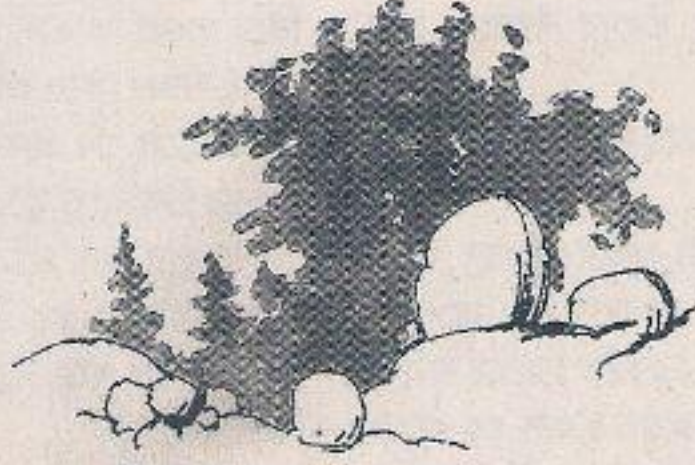
ছিল না, মাত্র সাড়ে [illegible] এতে ডাকাতির খরচ পোষায় না। তখন সেই অসমসাহসী ডাকাতরা বিনায়কবাবুকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যায় [illegible]।

আজকাল বাড়িতে কেউ বেশি ক্যাশ টাকা রাখে না। ক্রেডিট কার্ডের যুগ! তাছাড়া ছোট শহরেও পাড়ায়-পাড়ায় ব্যাঙ্ক। কিন্তু কালো টাকা বোধহয় ব্যাঙ্কে রাখাও নিরাপদ নয়। বিনায়কবাবুর বাড়ির আলমারিতে পাওয়া গেল তিনলাখ সাতাশ হাজার টাকা, বেশ কিছু সোনার গয়না।

সেসব সাফ করার পর আর-একটা কাণ্ড হল।

বিনায়কবাবুর মেয়ে রেবেকা দারুণ সাহসী। ডাকাতরা বাড়ির কাজের লোকজন সমেত সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তারই মধ্যে থেকে মিস রেবেকা ছুটে গিয়ে টেলিফোন করতে গিয়েছিল থানায়।

একজন ডাকাত তা দেখতে পেয়ে একটানে ছিঁড়ে ফ্যালে টেলিফোনের তার। তারপর রেবেকার মাথায় মারে রিভলভারের বাঁট দিয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে রেবেকা অজ্ঞান। তবু ডাকাতরা তার মুখের মধ্যে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে গেল।

অর্থাৎ, সাড়ে তিনলাখের মতো টাকা আর গয়না পেয়েও ডাকাতরা খুশি হতে পারেনি। রেবেকাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এরপর তারা মুক্তিপণ চাইবে। এরকম এখন সারা দেশে হামেশাই হচ্ছে।

দিবাকর ছুটে এসেছে আমাদের খবর দিতে তো বটেই, তা ছাড়া এই জেলার পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে তরুণমেসোর খুব চেনাশোনা। তাঁকে দিয়ে তো রেবেকা-উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তরুণমেসো তৃপ্তিমাসিকে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন গাড়ি নিয়ে। এই বিপদে ঝা পরিবারের পাশে গিয়ে তাঁদের দাঁড়াতে হবে। সুহাসিনীদেবী এখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন।

খুবই দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। তবু কথায় আছে না, 'কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ!'

আমার তো আনন্দে নৃত্য করা উচিত, দু'টো কারণে! প্রথমত, বিয়ের ঝঞ্ঝাট থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া গেল, আমাকে আর মুখে কিছু বলতে হবে না। যে বাড়িতে এরকম ভয়াবহ ডাকাতি হয়, সে বাড়িতে নিশ্চয়ই আর বিয়েটিয়ে নিয়ে প্রশ্নই উঠবে না অন্তত ছ'মাস-এক বছরের মধ্যে। ডাকাতির পরপরই বিয়ে হলে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে না! আর দ্বিতীয়ত, পাত্রীই তো উধাও। পাত্রী না থাকলে বিয়ে হবে কার সঙ্গে?

দ্বিতীয় কারণটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। ওটাই আমার আগে বলা উচিত ছিল।

পরদিন জামশেদপুর থেকে ছাপা খবরের কাগজে এই ডাকাতির রোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হল। আধপাতা ভরা রিপোর্ট, মাঝখানে রেবেকার ছবি। ডাকাতরা এখনও কেউ ধরা পড়েনি। পুলিশের সন্দেহ এটা কোনও সাধারণ ডাকাতদলের কাজ নয়, কোনও রাজনৈতিক দলের কীর্তি!

এখনও পর্যন্ত কোনও দলই এ দায়িত্ব স্বীকার করেনি। অপেক্ষা করতে হবে মুক্তিপণের দাবি আসে কোন দল থেকে। চারজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাই ডাকাতির তীব্র নিন্দে করেছেন। সেই চারজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন অরিন্দম মাহাতো।

রেবেকার কথা শুনে মনে হয়েছিল, অরিন্দম মাহাতো খুব রাগী ধরনের মানুষ। খুন-টুন করতে বা করাতেও তাঁর দ্বিধা নেই। এখন তিনি কী করবেন? নিজের হাত কামড়াবেন? আমার মতো এক চুনোপুঁটিকে টিট করা খুব সহজ, কিন্তু এবার ডাকাতদলের সঙ্গে লড়তে হবে।

যদি অরিন্দমের নিজের পার্টির চেয়েও কোনও বেশি শক্তিশালী পার্টি হয়? জঙ্গলের নকশাল বা মাওবাদী দলের কাছাকাছি তো পুলিশও ঘেঁষতে সাহস পায় না।

সাধারণ ডাকাতদের বদলে রাজনৈতিক দলের কাণ্ড হলেই ভাল, কারণ, তারা মেয়েদের সাধারণত খুন করে না, ধর্ষণ-টর্ষণও করে না। তবে কত টাকা চাইবে এবং টাকা না পেলে শেষ পর্যন্ত তারা কী করবে, সেটাই এখন চিন্তার বিষয়।

এই কাগজেই খবর পড়লাম আগামীকাল ঘাটশিলা বাজারের কাছে এক মিটিংয়ে বক্তৃতা দেবেন বিশিষ্ট যুবনেতা অরিন্দম মাহাতো।

মায়ের মুখ থেকে সেই হাসিখুশি ভাবটা আবার মুছে গিয়েছে। ছোট ছেলের সংসার, বিয়ে, কত স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, সব তছনছ হয়ে গেল। এবার কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই। ভাগ্যিস আমি দু'-একদিন আগেই সরে পড়িনি! মাসি-মেসোর তো এখনও ধারণা, আমি মাথায় টোপর পড়তে রাজি হয়ে গিয়েছিলুম! ভাগ্যের দোষে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা ফসকে গেল।

বাড়িতে এখন হাসিঠাট্টা একদম বন্ধ। ঘনঘন ফোন আসছে নানা জায়গা থেকে, তরুণমেসো কয়েক ঘন্টার জন্য গাড়ি নিয়ে ঘুরে এলেন জামশেদপুর।

রেবেকার অপহরণ প্রসঙ্গ নিয়েই সব কথা হয়। পেশাদার ডাকাত না রাজনৈতিক দল তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানতে পারছে না পুলিশ। গত দু' মাসে এই অঞ্চলে তিনটে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, পুলিশ একটারও কিনারা করতে পারেনি। কেউ ধরা পড়েনি। রাজনৈতিক দল হলে পুলিশের খানিকটা সুবিধে হয়। তাতে কোনও ধরপাকড় না হলেও পুলিশের উপর বিশেষ চাপ আসে না। যেমন রাজনৈতিক খুন যেন ঠিক খুন নয়। ও তো সব দলই করে থাকে, শাসক, বিরোধী সব দলই এ ব্যাপারে এক, তাই কাউকেই ঘাঁটায় না পুলিশ।

মাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আর কতদিন থাকবে এখানে?"

মা বললেন, "সত্যি, আমার আর এখানে মন টিকছে না। কিন্তু এখনই ফিরে যাওয়া কি ভাল দেখাবে? রাধার কী হয় না হয়... মেয়েটা যাতে ভালয়-ভালয় ফিরে আসে... ওর মা একেবারে শয্যাশায়ী।"

"তা হলে যদি আরও দু'চারদিন থাকতে চাও, আমি কি এর মধ্যে একবার চিলকিগড় ঘুরে আসব? ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে।"

"তা ঘুরে আয় না। শোন নিলু, আমরা এখানে আর-এক সপ্তাহের বেশি থাকব না। রাধা ফিরে এলেও এর মধ্যে তো আর বিয়ের ব্যবস্থা হবে না। যদি পরে কিছু আবার ঠিক হয়, তখন না হয় আমরা আবার ফিরে আসব।"

"মা, একবার বাধা পড়ে গিয়েছে, এখানে কি আর বিয়ের সম্বন্ধ করা ঠিক হবে? ওরা হয়তো ভাববে, এই পাত্রটাই অপয়া।"

"যাঃ! তোর আবার এ ধরনের কুসংস্কার হল কবে থেকে?"

"আমার কুসংস্কার বলছি না, ওদের যদি হয়।"

"সে তখন দেখা যাবে। তোর দাদা বলছিল না, ওর এক বন্ধুর অফিসে তোকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। তা যদি পাস, তা হলে কি অন্য মেয়ের অভাব হবে?"

"তা ঠিক, আমাদের দেশে আর যত কিছুরই অভাব থাক, মেয়ের অভাব নেই, ছেলেই কম! কিন্তু মা, দাদা যে চাকরিটার কথা বলেছে, তাতে মালিকের জুতো পালিশ করে দিতে হবে।"

"যাঃ, কী বাজে কথা বলছিস।"

"বাজে কথা নয়, রিসেন্টলি এই নিয়ম চালু হয়েছে। যে-কোনও নতুন চাকরিতে ঢুকতে গেলে অন্তত দু'মাস মালিকের জুতো পালিশ করা কম্পালসারি। আমি তো চটি পরেই চালিয়েছি এতদিন, নিজের জুতোও পালিশ করিনি কখনও। তাই আগে জুতো পালিশের ট্রেনিং নিতে হবে কিছুদিন।"

"আমাকে তুই যা বোঝাবি, তাই-ই আমি বিশ্বাস করব? অফিস-টফিসে বুঝি ইউনিয়ন থাকে না? তারা কিছু বলবে না?"

"হ্যাঁ, তারা বলবে, জুতো পালিশ করতে চাও না, তা হলে কম্পিউটার শিখে এসো। হয় কম্পিউটার নয় তো জুতো পালিশ, এ দু'টোর একটা ছাড়া আজকাল চাকরি হয় না!"

মা একটু ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, "তা হলে কম্পিউটার শিখলেই পারিস। খুব শক্ত বুঝি? চেষ্টা করে দ্যাখ না।"

আজ আমাদের ধারাগিরিতে গিয়ে পিকনিক করার কথা ছিল। ঝা পরিবারের এবং আমাদের প্রথম উদ্যোগটা যে বাতিল হয়ে গিয়েছে, বলাই বাহুল্য।

আরও কয়েকটা প্রোগ্রাম ছিল পরপর, কোনওটাই হবে না। তবু আমার এখানে পরে থাকার কী মানে হয়!

চিলকিগড়ে আমার এক বন্ধু ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন নেই। তাও এমনি-এমনি ঘুরে আসা যেতে পারে। রাজাদের গেস্ট হাউসে থাকা যায়। কিংবা ঝাড়গ্রাম। স্টেশনের পাশেই একটা হোটেলে দারুণ বাঁধাকপির ঝোল হয়।

সন্ধের সময় জানা গেল আবার এক চাঞ্চল্যকর খবর। অপহরণকারীদের কাছ থেকে ফোন এসেছে! এখনও দলের পরিচয় দেয়নি, কিন্তু রেবেকার মুক্তিপণ দাবি করেছে এক কোটি টাকা। সময়সীমা এক সপ্তাহ।

এক কোটি টাকা! পাগল নাকি? কোনও মেয়ের মুক্তিপণের আর্থিক মূল্য ঠিক হয় কীভাবে? সেই মেয়ের রূপ-যৌবনের নিরিখে? নাকি তার বাবার ক্ষমতা অনুযায়ী?

যতদূর শুনেছি, আজকাল নাকি কুড়ি লাখ টাকাই স্ট্যান্ডার্ড। তার বদলে এক কোটি? একটা ছোট শহরের মাঝারি হোটেলের মালিক এক কোটি টাকা জোগাড় করবে কী করে? হোটেল-বাড়ি সব বিক্রি করে দিলেও তো ওর অর্ধেকও উঠবে না। এর পরে কি দরাদরি হবে?

আর যদি রেবেকার রূপ-যৌবনের কারণেই নির্ধারিত হয় এক কোটি টাকা, তার জন্য তো রেবেকার গর্বিতই বোধ করা উচিত।

আমাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে যদি মুক্তিপণ চাইত এক লক্ষ টাকা, তা জেনে আমি কী করতুম? আমি বলতুম, মোটে এক লাখ? আমি কি এতই ফালতু! দাম বাড়াও, দাম বাড়াও। না হলে আমি যাবই না। তোমাদের কাছেই থেকে যাব!

॥ ৬ ॥

চিলকিগড় যাত্রা আর-একদিনের জন্য স্থগিত রেখে আমি শুনতে গেলুম মিটিং।

বাজারের কাছে এই জনসভায় ভিড় মন্দ হয়নি। আজকাল অনেক মানুষই গরম-গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে ভালবাসে। সেই জন্য সব দলের মিটিংয়েই অনেক শ্রোতা থাকে। একই লোক সরকার পক্ষ ও বিপক্ষ দলের বক্তৃতাও শুনতে যায়।

এই সভাটির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বক্তৃতা চলছে তিনটি ভাষায়। সাঁওতালি, হিন্দি এবং বাংলায়। মঞ্চের উপর বসে আছেন চারজন বক্তা। আমি পাশের একজন শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করলুম, "দাদা অরিন্দম মাহাতো কোন জন?"

লোকটি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি একটা গেঁয়ো ভূত! অরিন্দম মাহাতোকে চিনি না!

আঙুল তুলে সে একজনকে দেখাল, তিনি উপবিষ্ট নন, মঞ্চের উপর ঘোরাঘুরি করছেন, কিছু না-কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন ভলান্টিয়ারদের। বেশ লম্বা ও সুঠাম স্বাস্থ্যবান পুরুষ, প্যান্ট ও রঙিন শার্ট পরা, গায়ের রং কুচকুচে কালো, ঝকঝকে নাক-চোখ, বেশ সুপুরুষ।

আমাদের সিনেমার নায়ক-নায়িকারা সকলেই ফরসা-ফরসা। কেন রে বাবা! ইন্ডিয়ায় ফরসাদের তুলনায় কালো রঙের নারী-পুরুষই তো অনেক বেশি। তা হলে কালো ছেলেমেয়েরা কেন নায়ক-নায়িকা হয় না?

অরিন্দম মাহাতোকে যে কেন রেবেকার পছন্দ, তার প্রথম কারণটা তো বোঝাই যাচ্ছে। পহেলে দর্শনধারী, ওর পাশে দাঁড়ালে আমাকে মনে হবে একটা মর্কট! এ ছাড়া ওর অনেক গুণও আছে নিশ্চয়ই।

একটু পরেই বোঝা গেল, অরিন্দম মাহাতো একজন অতি সুবক্তা। আত্মবিশ্বাস ভরা জোরালো কণ্ঠস্বর, শুনলেই বোঝা যায় নেতা হওয়ার অনেক যোগ্যতা আছে ওর। অদূর ভবিষ্যতেই মন্ত্রী-টন্ত্রি হবে।

অরিন্দম বক্তৃতা দিচ্ছে পরিষ্কার বাংলা ভাষায়। বক্তৃতার বিষয়ও ভাষা। বিহার থেকে কেটে নেওয়া ঝাড়খন্ড রাজ্যে শতকরা চুয়াল্লিশ জন মানুষই নাকি বাঙালি। কিন্তু বাংলা ভাষার কোনও স্বীকৃতি নেই। আর আদিবাসীদের জন্য গড়া এই রাজ্যে আদিবাসীদের কোনও ভাষাও মর্যাদা পায়নি। রাজ্যের ভাষা হিন্দি। এ কথা ঠিক, হিন্দি এখানে অনেকেই বুঝতে ও বলতে পারে। কিন্তু মাতৃভাষা কিংবা নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষা তো নয়। তাই বাংলা ও সাঁওতালি ভাষাকেও রাজ্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবি উঠেছে, অরিন্দম বলে যাচ্ছে সেই দাবির সমর্থনে।

খুব দীর্ঘ বক্তৃতা নয়,-মোটামুটি কুড়ি মিনিট। তারপর প্রবল হাততালি।

আমার কেন যেন ধারণা হয়েছিল, রেবেকা অপহরণের কারণে অরিন্দম খুবই মুষড়ে পরবে। আজ বক্তৃতা দিতে আসবেই না। কিংবা বক্তৃতা দিলেও গলা ভাঙা-ভাঙা শোনাবে। মন খারাপ থাকলে যেমন হয়।

কিন্তু অরিন্দম বক্তৃতা দিল পুরো দাপটের সঙ্গে। মন খারাপের কোনও চিহ্নই নেই। ভাষার দাবি ছাড়াও সে বর্তমান সরকারকে তুলোধনা করল নানা প্রসঙ্গে। কিন্তু ডাকাতি কিংবা আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে কিছু উল্লেখই করল না।

যারা রাজনীতি করে, তারা বোধহয় ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রকাশ্যে টেনে আনে না।

মিটিং শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু আমি বসে রইলুম কিছুক্ষণ। অরিন্দমের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে পারলে ভাল হত। লোকটাকে ঠিকমতো চেনা গেল না। তার প্রেমিকার দিকে কেউ নজর দিলে সে তাকে খুন করে ফেলতেও দ্বিধা করবে না, এমনই তার প্রেম! কিন্তু যারা রাজনীতি নিয়ে এত মত্ত, তারা কি সত্যিকারের প্রেমিক হতে পারে?

আমার এসব জানবারই বা কী দরকার! বিয়ের ঝঞ্ঝাট থেকে আমি মুক্তি পেয়ে গিয়েছি, আর তো এ ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানো উচিতই না। তবু অরিন্দম যেন আমাকে চুম্বকের মতো টানছে।

একটু পরেই একজন যুবক এসে আমাকে বলল, "আপকো মাহাতোজি বুলাতা হ্যায়।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "হামকো?"

ছেলেটা দু'বার মাথা ঝাঁকাল।

কিন্তু আমাকে মাহাতোজি ডাকবে কেন? আমাকে তো সে চেনেই না। কখনও দেখা হয়নি। ঠিক আছে, ডাকলে যাব না কেন!

জনতা ছড়িয়ে পড়ছে নানা দিকে। তাদের মাঝখান দিয়ে যেতে-যেতে ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপ কলকাত্তা সে আয়ে হেঁ? আপ রিপোর্টার হ্যায়?"

মিটিং তো যে-কোনও লোকই শুনতে আসতে পারে। যারা বাজার করতে এসেছে, তাদের মধ্যেও কিছু লোক উঁকি মেরে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। কিন্তু ছেলেটি যখন নিজে থেকেই আমাকে রিপোর্টার ভেবেছে, তখন সেটা মেনে নেওয়াই ভাল। কাগজের লোক জানলে অনেকে বেশ খাতির করে।

মঞ্চের পিছন দিকে একটা চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট টানছে অরিন্দম মাহাতো। কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা পরিবৃত হয়ে। পলিটিক্যাল নেতারা কখনও একা থাকে না!

আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হবে অরিন্দম। সিগারেট টানে

মুঠো করে, মাথার চুল কোঁকড়া। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললুম, "নমস্তে। আপনি আমাকে ডেকেছেন?"

বাংলাতেই জবাব দিল অরিন্দম। নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে সে বলল, "আমাকে একজন বলল একজন রিপোর্টার এসেছে, আপনি কোন নিউজপেপারের?"

এসব ক্ষেত্রে ইংরেজি কাগজের নাম বলাই ভাল, চোখ বুজে বলে দিলুম, "টি টি।"

চোখ আরও সঙ্কুচিত করে সে জিজ্ঞেস করল, "টি টি! সে আবার কোন কাগজ!"

আমি বললুম, "আই অ্যাম সরি, দ্য টেলিগ্রাফ। নিজেদের মধ্যে সংক্ষেপে বলি টি টি।"

"আপনি কি এই মিটিং কভার করার জন্য কলকাতা থেকে এসেছেন?"

"শুধু এই মিটিং নয়, এই রাজ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা সরেজমিন রিপোর্ট তৈরি করা..."

"রিপোর্ট লিখবেন, আর পলিটিক্যাল লিডারদের সঙ্গে কথা বলবেন না?"

"তা তো বলতেই হবে। আমি ভাবছিলাম, আপনি একটু ফ্রি হলে যদি আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন।"

"আমি এখনই ফ্রি আছি।"

"আপনাকে তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"করুন।"

"আপনি বাংলাতেই উত্তর দেবেন। পরে আমি..."

"তার মানে, আপনি ধরেই নিয়েছেন, আমি ইংরেজি জানি না। আমার টাইটেল মাহাতো, সে আবার কী ইংরিজি জানবে! আমি শান্তিনিকেতনে পড়েছি, বিশ্বভারতীর গ্র্যাজুয়েট।"

আমি ত্রস্ত হয়ে বললুম, "না, না, সে কথা ভেবে বলিনি। মানে, মুখে-মুখে ইংরিজি শুনে সঙ্গে-সঙ্গে লিখে নিতে আমারই অসুবিধে হয়। শর্টহ্যান্ড শিখিনি তো। তাই প্রথমে বাংলায় লিখে পরে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নিই।"

অরিন্দম আমাকে বসতে বলেনি। তার এক চ্যালা বলল, "বৈঠিয়ে, আপ বৈঠিয়ে। চায়ে পিয়েঙ্গে?"

হঠাৎ আমার একটু ভয় ধরে গেল। রিপোর্টার সেজেছি, অথচ সঙ্গে কাগজ-কলম কিছুই নেই। অরিন্দমের মুখে রাগ-রাগ ভাব। ধরা পরে যাব নাকি?

এক চ্যালাকে বললুম, "মেরা নোটবুক ছোড়কে আয়া। একঠো কাগজ অউর পেন..."

অরিন্দম বলল, "আপনি কোথায় পড়ালিখা করেছেন?"

আমি বললুম, "একটা মফস্‌সল কলেজে। ডায়মন্ড হারবারের দিকে।"

"আপনি জানেন, আমরা বাংলা ভাষার জন্য ফাইট করছি, কিন্তু এখানকার অনেক বাঙালিই এখন বাংলা পড়ে না। ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখায় না।"

"তাই নাকি?"

"জি হাঁ। আপনি কী রকম বাংলা জানেন, দেখি তো! বলুন, এটা কার লেখা:

সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি!
মেজবউ কোথা! ডেকে দাও তারে—
কোথা ধোকা, কোথা লুচি!
এখন আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি—
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাঠালে
কী জানি কী করে বসি!
স্বামী সবে এল যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই দুটি ভাজা!
আর্য নারীর এ কেমন প্রথা
সমুচিত দিব সাজা।

বলুন, কার লেখা? কোথায় আছে?"

আমার মুখ একেবারে সাদা। এ কবিতা আমি কখনও পড়িনি, শুনিওনি। কার লেখা তা বলাও আমার পক্ষে অসাধ্য।

অকপটে তা স্বীকার করতেই হল।

অরিন্দম তাঁর সাগরেদদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাঙালিরা লুচিভাজা না পেলেই খেপচুরিয়াস। লুচিভাজা!"

সবাই হেসে উঠল।

এই রে, এরা বাংলা ভাষা নিয়ে এত বক্তৃতা দিলেও আসলে কি অ্যান্টি-বেঙ্গলি?

কথা ঘোরাবার জন্য বললুম, "আমার অন্য একটা কাজ আছে। আমার প্রশ্নগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারি? মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন।"

"ঠিক আছে, আমারও অন্য কাজ আছে, চটপট বলুন।"

"ঝাড়খন্ড রাজ্যে ভাষানীতি বিষয়ে আপনার মতামত তো শুনে নিয়েছি। আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি রাজনীতিতে ভায়োলেন্স বিশ্বাস করেন?"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই নেই। এখন কি এমন কোনও দল আছে, যারা যখন-তখন মারামারি-কাটাকাটি করে না? এই গাঁধীজির ইন্ডিয়ায় সবাই তো হিংসার রাজনীতির আশ্রয় নিচ্ছে এখন।"

"কিন্তু গণতন্ত্রে..."

"শুনুন, রিপোর্টারবাবু, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে করুন, আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। সব নিয়মকানুন মেনে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছেন। তবু পিছন থেকে একটা ট্রাক এসে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে দিল। এরকম হয় না? সুতরাং আপনাকে শুধু ঠিকঠাক গাড়ি চালালেই হবে না, কোন শালা কখন এসে আপনাকে মারবে, তার জন্যও তৈরি থাকতে হবে। সেই রকম, আপনি গণতান্ত্রিক পথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছেন। যে-ই অন্য শুয়োরের বাচ্চারা জানবে যে, আপনি শান্তিপূর্ণ, নিরীহ, তখনই এসে গুলি চালিয়ে আপনাকে খতম করে দেবে। তাই সব পার্টিকেই এখন আর্মস রাখতে হয়। বুঝলেন?"

"হ্যাঁ, বুঝলাম। আপনি কি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন?"

"ইলেকশনে দাঁড়াব, নাকি ইলেকশনে শুয়ে থাকব। আচ্ছা বলুন তো, আপনি আমার সম্পর্কে কী জানেন? কিছু হোমওয়ার্ক করেছেন?"

"জানি মানে, আপনি নাম করা ইউথ লিডার, বিশ্বভারতীতে পড়েছেন, আপনি ভাল বক্তা, ইয়ে..."

অরিন্দমের এক চ্যালা বলল, "মাহাতোজি স্ট্যান্ডিং এম পি। রেকর্ড মার্জিন ভোটে জিতেছেন!"

অরিন্দম বলল, "তুমি শালা কিছু জানো না। তুমি মোটেই রিপোর্টার নও। ভাঁওতা মারতে এসেছ। তুমি কলকাতা থেকে এসেছ এখানে বিয়ে করতে। বিয়ে করে হোটেলের মালিক হতে।"

এক চ্যালার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কী রে লাখরা, ঠিক বলিনি?"

সে ব্যক্তি বলল, "একদম ঠিক। কিন্তু সে পাখি তো উড়ে গিয়েছে!"

অরিন্দম বলল, "নিজে উড়ে যায়নি রে, কেউ খাঁচায় ভরে রেখেছে।"

উঠে দাঁড়িয়ে সে আমাকে বলল, "চলো।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায়?"

সে বলল, "যেখানে তোমাকে নিয়ে যাব। ওরে লাখরা, গাড়ি রেডি করতে বল।"

আমি আমসি মুখ করে বললুম, "মাহাতোবাবু। আপনি ভুল ভেবেছেন। বিয়ের একটা কথা হয়েছিল বটে। কিন্তু আমি নিজেই সেটা..."

অরিন্দম বলল, "ওসব বাবু-টাবু বলা আমি পছন্দ করি না। আমি বাবু নই। এখন তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

আমি বললুম, "আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। একটা জরুরি ফোন আসবে।"

"গোলি মারো ফোন!"

চেয়ারের গায়ে ঝোলানো একটা লম্বা কোট সে গায়ে দিল। তার এ পকেট, সে পকেটে হাত দিয়ে খুঁজে বের করে আনল সিগারেট লাইটার। খোঁজার সময় এক পকেট থেকে যে জিনিসটি উঁকি মারল, সেটি একটি রিভলভারের বাঁট।

সিগারেট ধরিয়ে সে আমার পিঠে হাত রেখে বলল, "চলো রিপোর্টারসাব।"

এবার আমি কী করব? ওর পায়ে ধরে বলব, মাহাতোজি, আমি নির্দোষ! আমি আপনার প্রেমিকার দিকে একটুও হাত বাড়াইনি, হোটেলের মালিক হতেও চাইনি, কেন আমার উপর রাগ করছেন! কিন্তু এসব কথা সহজে বলা যায় না। অরিন্দমও আমার কোনও কথাই শুনতে চাইছে না।

বাইরে একটা হুডখোলা জিপ। তার ড্রাইভারের পাশে বসালো আমাকে, তারপর অরিন্দম নিজে বসল। পিছনে বসল তার দু'জন চ্যালা। জিপটা ছুটল জামশেদপুরের দিকে। আর কোনও কথা বলছে না অরিন্দম। গুনগুন করে কী যেন একটা গান গাইছে আপনমনে।

কী ব্যাপার, আমাকে মেরেই ফেলবে নাকি?

বিদ্যাসাগরমশাইয়ের প্রথম ভাগে একটি ছেলে বলেছিল, "মাসি, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ।"

এখানেও মৃত্যুর আগে আমাকে বলতে হবে, তৃপ্তিমাসি তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ! কী যে একটা খামখেয়াল চেপেছিল তোমার মাথায়!

কাল রেবেকার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হওয়ার পরই অত তাড়াতাড়ি ডাকাতগুলো না এলেই পারত! একদিন অন্তত দেরি করে এলে রেবেকা তার মধ্যেই অরিন্দমকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিত আমার ভূমিকার কথা। মানে, কোনও ভূমিকাই না থাকার কথা।

খানিকটা দূর বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পর গাড়িটা বেঁকল পাশের একটা সরু রাস্তায়। সামনেই দেখা যাচ্ছে জঙ্গল।

মিনিট দু'-এক পরেই পিছনদিক থেকে এক চ্যালা চেঁচিয়ে উঠল, "আর-একটা গাড়ি আসছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে অরিন্দম হুকুম দিল, "সাইড কর, সাইড কর।"

পকেট থেকে রিভলবার বের করে লাফিয়ে নেমে গেল অরিন্দম। তার দুই চ্যালা আর ড্রাইভারও দাঁড়াল তার পাশে। আমাকে নামতে বলল না।

একটা গাড়ি আসছে আমাদের পিছনদিক থেকে। পুলিশের গাড়ি? পুলিশ এসে আমায় বাঁচিয়ে দেবে? শুধু সিনেমায় কেন, বাস্তব জীবনেও তো এরকম হতেই পারে! কিংবা ওরা কোনও শত্রুপক্ষ? দু' পক্ষের গুলি বিনিময় হবে, মাঝখানে থাকব আমি। আমাকে মারাই সবচেয়ে সহজ।

গাড়িটা এসে এই গাড়ির কাছে দাঁড়াল। তাতে লেখা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। ভিতরে দু'জন রাইফেলধারী গার্ড। অরিন্দম এগিয়ে আসতেই গার্ড দু'জন তাকে সসম্ভ্রমে স্যালুট করল। তা তো দেবেই। অরিন্দম মাহাতো একজন এম পি। একজন জলজ্যান্ত এম পিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন?"

অরিন্দম কীসব বলার পর ফরেস্টের গাড়িটা চলে গেল। অরিন্দম ফিরে এসে আপন মনেই বলল, "মাঝে-মাঝে মাওবাদীরা এসে হামলা করে। তাই সাবধানে থাকতে হয়।" এর পর সে গান ধরল চাপা গলায়।

যারা খুন করে, তারা কি খুনের আগে গান গায়? খুনও কি সৃষ্টিসুখের উল্লাসের মতো কিছু একটা ব্যাপার?

একটু পরেই অরিন্দম গান থামিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি শাল আর সেগুনগাছের তফাত জানো?"

আমি মাথা নেড়ে জানালুম জানি।

পাশের জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এর মধ্যে কোনটা শাল আর কোনটা সেগুন বলো তো?"

আমি বললুম, "সেগুন তো একটাও দেখতে পাচ্ছি না, সবই শাল।"

অরিন্দম বলল, "আছে দু'-একটা। জানো তো, সেগুনগাছ খুব দামি। কিন্তু জঙ্গলের আদিবাসীদের কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু শালগাছ থেকে অনেক কিছু পায়।"

আমি বললুম, "শাল বাঁচাও, সেগুন হঠাও, এ আন্দোলনের কথা আমি শুনেছি।"

অরিন্দম আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "বাঃ, বেশ জানো দেখছি। তুমি কখনও জঙ্গলে থেকেছ?"

"অনেকবার।"

"কেন?"

"কোনও কারণ নেই, শুধু জঙ্গলে থাকার জন্যই থেকেছি। সারান্ডা ফরেস্ট আমার প্রিয়। কারো নদীর ধারে।"

"অর্থাৎ, তুমি পলিটিক্সের খবর কিছু রাখো না, প্রকৃতিপ্রেমী!"

এ আবার কী ধরনের কথাবার্তা? খুন-ফুনের আগে এই সব সাধারণ আলোচনার কোনও মানে হয়? খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলুম, "মাহাতোজি, অনেস্টলি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"স্বচ্ছন্দে!"

"আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? কেন নিয়ে যাচ্ছেন?"

"ওই যে সামনে জায়গাটা দেখছ, ওটা আমার একটা খামারবাড়ি। ওখানে এসে আমি মাঝেমাঝে থাকি। ওখানে গিয়ে রুটি-মাংস খাবে আমার সঙ্গে। আর শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কী কথা? এখন বলতে পারেন না?"

"তুমি রেবেকাকে এখনও বিয়ে করতে রাজি আছ?"

"কী বলছেন আপনি। সে প্রশ্নই ওঠে না!"

"শোনো, শোনো। তাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যদি সে ফিরে আসে, তখনও তুমি কি...আমি আমার ক্লেম ছেড়ে দিতে রাজি আছি। সাপোজ, রেবেকার মনটা পালটে গেল, সে তোমাকেই পছন্দ করে ফেলল। তখন কি আমি জোরজুলুম করব নাকি? ওসবের মধ্যে আমি নেই।"

"মাহাতোজি, আমি আপনার সম্পর্কে যেমন কিছু জানি না, তেমনই আপনিও আমার সম্পর্কে কিছু জানেন না। এ পৃথিবীর নীললোহিতরা কখনও বিয়ে করে না। মানে, তাদের বিয়ে হবে না। নীললোহিতরা কখনও হোটেলের মালিকও হয় না। এই ধারণাটাই অ্যাবসার্ড!"

"ঠিক আছে, চলো, পৌঁছে গিয়েছি।"

জিপটা থামল একটা সাদা রঙের একতলা বাড়ির সামনে। দু'পাশে অনেকখানি বাগান। কাছেই গোয়ালঘরে গোটাচারেক গোরু।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই একজন বুড়ো লোক দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই অরিন্দম দরাজগলায় ডাকল, "রেবেকা, রেবেকা! দ্যাখো, কে এসেছে!"

সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এল সেই নারী। আজ সে শাড়ি পরেছে। কপালে একটা কাচ পোকার টিপ। হাতে একটা রাইফেল।

আমি যাকে বলে হতবাক!
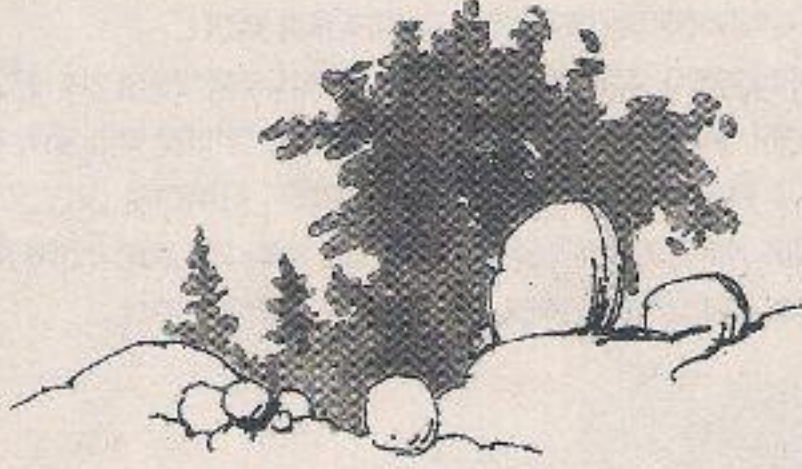
অরিন্দম বললেন, "দ্যাখো রিপোর্টার, এখনও যদি ইচ্ছে থাকে, আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। কী রে রাধি, এই ছেলেটাকে বিয়ে করবি?"

রাইফেলটা তুলে রেবেকা হাসতে-হাসতে তাকে বলল, "তুমকো গোলি মার দুঙ্গা!"

অরিন্দম অট্টহাসি করে উঠল।

আমি কোনও কথা বলছি না দেখে অরিন্দম বলল, " বৈঠো, বৈঠো। রাধি মাংস রান্না করেছিস তো? পেটে আগুন জ্বলছে। তুই রাইফেল নিয়ে ঘুরছিস কেন? কেউ এসেছিল?"

রেবেকা বলল, "একটা শুয়োর।"

"মেরেছিস?"

"না, ঠিক লাগল না। আর মিতুলাল এসেছিল, টাকা দিয়ে গিয়েছে, তিন হাজার কম আছে। আমি বলে দিয়েছি, যাক ঠিক আছে।"

"আর গয়না?"

"সব দিয়ে গিয়েছে। ঠিকঠাক আছে।"

"ওসব কথা পরে হবে। বলছি না, খুব জোর খিদে পেয়েছে!"

খানা রেডি আছে। গরম করে দিচ্ছি এর জন্য। বাঙালিরা ঠান্ডা মাংস খেতে পারে না। রুটি না ভাত?"

"দু'টোই রাখবি। তার আগে রামের বট্‌লটা দিয়ে যেতে বল। একটু গলা ভিজিয়ে নিই। শালা, লেকচার দিলেই গলা খুব শুকিয়ে যায়!"

আমার দিকে তাকিয়ে রেবেকা শুধু বলল, "আবার তা হলে দেখা হয়ে গেল!"

আমি শুধু হাসলুম একটু।

রেবেকা ভিতরে চলে যাওয়ার পর অরিন্দম আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কি, ক্রাইম স্টোরির মতো লাগছে? ঘটনা খুব সোজা। আমি পলিটিক্স করি, কিন্তু ডাকাতি করি না। হ্যাঁ, ডোনেশন নিই, কখনও-কখনও ব্যবসায়ী কোর্স করি। কিন্তু হার্ডকোর ডাকাতি কিংবা মেয়েমানুষ চুরি, ওসব নোংরা কাজ করি না। তবে আমার গার্লফ্রেন্ডকে কোনও ডাকাতদল চুরি করে নিয়ে যাবে, তারপরেও তারা বেঁচে থাকবে, এ ঝাড়খণ্ডে তা হতে পারে না! এতক্ষণে অনেকগুলো লাশ পড়ে যেত। ও হারামিগুলো আগে বোঝেনি, জানত নাকি, ঝাবাবুর মেয়ে আমার ফিয়াসে! জানলে ওর ধার ঘেঁষত না। যখনই তা জানল, আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। শুনলেন তো! টাকা আর গয়নাও ফেরত দিয়েছে শালারা। রেবেকাই বলেছে, ওর ইজ্জত নষ্ট করেনি। তাই ওদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ওরা যে এক কোটি টাকা র‍্যানসাম চেয়েছে!"

আবার অট্টহাসি করে উঠল অরিন্দম। তারপর বলল, "ওটা আমরা করিয়েছি। আমারই এক সাগরেদ মোটা গলা করে বলেছে, এক কোটি টাকা চাই। বুঝলেন না, ওতে হাতে অনেকটা সময় পাওয়া গেল! আমি এম পি, পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করবে না। তবু একটু সাসপেন্স রাখা গেল। নেক্সট উইকে আমি দিল্লি যাচ্ছি, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সেখানে আমাদের বিয়ে হবে। আমি অবশ্য বলেছিলাম, এখানেই রেজিস্ট্রার ডেকে সিভিল ম্যারেজ করে নিতে পারি। রেবেকা রাজি হচ্ছে না। অন্তত কয়েকটা দিন ও আমার সঙ্গে, ওই যে কী বলে, লিভ টুগেদার করতে চায়!

আমি বললুম, "মাহাতোজি সত্যি আপনারা একেবারে..."

কৃত্রিম ধমক দিয়ে অরিন্দম বলল, "আমাকে আর অত আপনি-আজ্ঞে করতে হবে না। তুমি তো শালা আমার রাইভ্যাল হলেও হতে পারতে। রেবেকা তোমাকে চাইল না, সেটা তোমার ব্যাড লাক!"

আমি এতক্ষণ পরে খোলামনে বললুম, "চিরকালই আমার ব্যাড লাক। কোনও মেয়েই আমাকে পছন্দ করে না। পাত্তাই দেয় না। কী আর করা যাবে!"

কিঞ্চিৎ রামপানের পর রুটি আর মাংস খাওয়া হল কবজি ডুবিয়ে, সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ আর ঝাল কাঁচালঙ্কা।

হোটেল মালিকের মেয়ে, বাড়িতে রান্নাঘর নেই, বরাবর হোটেলের খাবার খায়। তবু রান্না শিখল কী করে, সেটাও এক রহস্য।

বেশ ভালই রাঁধে।